মসীহ, কুরআন ও আখীরুজ্জামান

আনসারী স্মরণিকা সিরিজ

মসীহ, কুরআন ও আখীরুজ্জামান

(অর্থাৎ, ইতিহাসের সমাপ্তি)

"যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে, তাঁর কসম! খুব শিগগিরই মারিয়ামের পুত্র (ঈসা) তোমাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে অবতীর্ণ হবেন।

(ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী)

ইমরান নজর হোসেন

ইমরান এন.হোসেন প্রকাশনা

প্রকাশক:
ইমরান নাযর হোসেন পাবলিকেশনস
৩, ক্যালসাইট ক্রিসেন্ট
ইউনিয়ন হল গার্ডেন্স
সান ফেরান্দো, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো

ওয়েবসাইট: www.imranhosein.org
ইমেল: inhosein@imranhosein.org
বুকস্টোর: www.imranhosein.com; www.imranhosein.pk

প্রিন্ট: পাকিস্তানে

সম্রাট শান্তি চেয়েছিলেন—সুলতান দিয়েছিলেন যুদ্ধের জবাব।

এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হলো সম্রাট একাদশ কনস্টানটাইনকে,

যিনি ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল রক্ষা করতে গিয়ে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেন। এবং সেই সাথে তাঁর সেই ৭০০০ সৈন্যকেও, যারা নিজেদের সংখ্যার দশগুণেরও বেশি বড় এক আক্রমণকারী অটোমান বাহিনীর সাথে লড়াই করতে গিয়ে বীরের মতো মারা যান। কিয়ামতের দিন অনেক কিছুই অবাক করার মতো ঘটবে, যখন এই দুই সেনাবাহিনী বিচারের জন্য মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে।

وَ اِنَّ مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ لَمَنۡ يُّؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِمۡ خٰشِعِيۡنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشۡتَرُوۡنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ

আর নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যেও এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে উভয়ের প্রতিই ঈমান রাখে; তারা আল্লাহর সামনে বিনীত ও নম্র থাকে, এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট পুরস্কার। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতি দ্রুত।

সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯

কুরআন উপরে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, এমন কিছু ইহুদি ও খ্রিস্টান থাকবে যারা শেষ পর্যন্ত কুরআনকে এক আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকার করবে এবং সেই সঙ্গে মুহাম্মদ ﷺ-কে তাঁর রাসূল হিসেবে মেনে নেবে। তবুও তারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় ‘আহলুল কিতাব’ হিসেবে বজায় রাখবে।

সূচিপত্র

ভূমিকা। 8
মুখবন্ধ। 18
প্রারম্ভিক মন্তব্য। 20
এই বইটি ও ইসলামিক এসক্যাটোলজি (শেষ জামানা সম্পর্কিত বিদ্যা)। 20
বিশ্বাসী খ্রিস্টান, যারা যিশু (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 22
যারা যিশু (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে। 24
ইসলামে পবিত্র বিষয়াবলির সাহিত্যিক শিষ্টাচারের নীতি। 25

অধ্যায়: ১

ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে মসীহের প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত। 28

ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় পবিত্র রাষ্ট্র। 28
নিষিদ্ধ বৃক্ষের রহস্য। 29
ইতিহাসের শুরুতে ঘটা ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের শেষ মুহূর্তের
সমান্তরালতা। 34
পবিত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। 36
পবিত্র রাষ্ট্র, পবিত্র ভূমি এবং ইস্রায়েলি জাতি। 39
পবিত্র ভূমির প্রতিশ্রুতি শর্তযুক্ত না শর্তহীন?। 43
পবিত্র ইস্রায়েল রাষ্ট্রের হঠাৎ বিলুপ্তি। 50
জাসাদই আসলে দাজ্জাল, ভন্ড মসীহ।..... 52
মসীহ আগমনের ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি। 53

অধ্যায়: ২

কুরআনে মসীহের বংশপরিচয় ও পরিচিতি। 55

ইহুদি, খ্রিস্টান ও মসীহ। 56
মসিহের বংশপরিচয় ও ইমরানের পরিবার। 59
মসীহ এক কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 68
মারিয়াম এবং দোলনায় এক নবজাতক শিশু। 76
ঈসা ইবনে মারিয়াম প্রকৃত মসীহ। 81

মসীহের অলৌকিক ঘটনাবলী। 84
ইস্রায়েলিদের মহান বিভক্তি। 87
খ্রিস্টানদের উপর মহা আক্রমণ। 88
মসীহের প্রকৃত অনুসারী কারা?। 92

অধ্যায়: ৩

কুরআন ও মসীহের পুনরাগমন। 96

ক্রুশবিদ্ধকরণ ও মসীহের প্রত্যাবর্তন। 97
কুরআন থেকে প্রথম প্রমাণ যে ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন। 99
কুরআন থেকে দ্বিতীয় প্রমাণ যে ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন। 112
কুরআন থেকে তৃতীয় প্রমাণ যে ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন। 120
কুরআন থেকে চতুর্থ প্রমাণ যে ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন। 125
কুরআন থেকে পঞ্চম প্রমাণ যে ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন। 134

অধ্যায়: ৪

মসীহের প্রত্যাবর্তনের প্রভাব ও পরিণতি। 137
মসীহ সেই একই সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করবেন,
যাদের প্রতি তাঁকে প্রথমবার প্রেরণ করা হয়েছিল।..... 137
মসীহ ও ইমাম আল-মাহদী। 140
দামেস্কের এক মাসজিদে মসীহের নাটকীয় অবতরণ। 143
ইমামের নেতৃত্বে নামাজে মসীহের অংশগ্রহণের তাৎপর্য। 145
মসীহ কি নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের একজন সদস্য হিসেবে
প্রত্যাবর্তন করবেন?। 149
প্রকৃত মসীহের সাথে ভণ্ড মসীহের মোকাবিলা। 157
মসীহ ইসলামের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। 161
তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন
এবং জিযিয়া কর রহিত করবেন। 162
শেষ কথা। 163
অনুবাদকের নিবেদন। 166

ভূমিকা

মিশা জোভানোভিচ

[মিশা জোভানোভিচ একজন খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ এবং শেষ জামানা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। তিনি খ্রিস্টান আধ্যাত্মিক দর্শনেও বিশেষভাবে পারদর্শী। তিনি প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে পড়াশোনা করেছেন এবং গ্রীক ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ। তিনি অর্থোডক্স ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁর ছাত্রদের ইঞ্জিল শরীফ (Gospels) মুখস্থ করতে এবং এর গভীর প্রতীকী ও ঐতিহ্যবাহী ব্যাখ্যাগুলো বুঝতে শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বর্তমানে ফ্রান্সে বসবাস করছেন।
তাঁর সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: micha.jovanovic@gmail.com]

"তখন যোহন বললেন, হে প্রভু, আমরা একজনকে দেখলাম যে আপনার নাম নিয়ে শয়তান (বা মন্দ আত্মা) তাড়িয়ে দিচ্ছে; কিন্তু সে আমাদের দলভুক্ত নয় বলে আমরা তাকে বাধা দিয়েছি। তখন ঈসা (আ.) তাকে বললেন, তাকে বাধা দিও না; কারণ যে ব্যক্তি তোমাদের বিরুদ্ধে নয়, সে আসলে তোমাদের পক্ষেই আছে।"

(লূক ৯: ৪৯-৫০)

কয়েক বছর আগে আমি আমার বন্ধু ডক্টর ভ্লাদিমির পাভিসেভিচকে ফোন করে একটি খবর দিয়েছিলাম: "চলো, একজন ইসলামি পণ্ডিত বা শেখ-এর সাথে দেখা করতে যাই, যিনি অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের প্রতি ঐক্যের ডাক দিয়েছেন।" আমার এই বন্ধুটি যুদ্ধের বছরগুলোতে জাতিসংঘে যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি একাকী এক প্রতিকূল বিশ্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে লড়েছেন। শেখ ইমরান হোসেনের আহ্বানে আমরা প্রথমবারের মতো এমন এক বক্তব্য শুনতে পেলাম, যার জন্য আমরা বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করছিলাম। তাঁর এই কথাগুলো যদি আগে শোনা যেত, তবে হয়তো বলকান অঞ্চলের সেই মর্মান্তিক যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হতো। আমি মনে করি, শেখ ইমরানের এই বক্তব্য যদি ইউরোপের স্লাভিক জাতিগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ফিরিয়ে আনতে নাও পারে, তবুও এটি এক বৃহত্তর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের অংশ—যে সংগ্রাম ইতিহাসের শেষ সময়ে তার চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে।

যখন আমরা শেখ ইমরান হোসেনের সাথে দেখা করলাম, তিনি আমাকে কুরআনের এক রহস্যময় চরিত্র 'খিজির' (আ.) সম্পর্কে বললেন এবং তাঁর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, কুরআনের এই খিজির চরিত্রের সব বৈশিষ্ট্য আমাদের অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের মসীহ বা যিশুর (ঈসা আ.) সাথে মিলে যায়। যেমন—খিজির নামের সবুজ রং যা জীবনদায়ী শক্তির প্রতীক; দুই সমুদ্রের মিলনস্থল যা তাঁর দ্বৈত প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়; পাথর যা বিশ্বাসের প্রতীক; এবং কুরআনে বর্ণিত সেই নৌকা ফুটো করার ঘটনাটি মূলত চার্চ বা গির্জার ওপর আসা সেই সব কঠিন পরীক্ষার সংকেত, যা সত্য বিশ্বাসীদের অতিক্রম করতে হয়। এমনকি 'খিজির' এবং 'খ্রিস্ট' শব্দ দুটির উচ্চারণেও এক ধরনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও আমি কুরআন নিয়ে কথা বলার যোগ্য নই, তবুও একজন অর্থোডক্স খ্রিস্টান হিসেবে আমি কুরআনের বাণীতে আমার নিজ বিশ্বাসের এক বিস্ময়কর প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছি।

এরপর আমরা ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের ‘এস্ক্যাটোলজি’ বা শেষ জামানা বিষয়ক জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করলাম। যারা এই বিষয়টি সম্পর্কে জানেন না, তাদের জানাই যে—এস্ক্যাটোলজি হলো খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের তৃতীয় শাখা, যা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সহজ কথায় এটি হলো ‘নবীগণের বিজ্ঞান’। ধর্মতত্ত্বের অন্য দুটি শাখা হলো—মূল ঈশ্বরতত্ত্ব এবং পরিত্রাণতত্ত্ব ।

অর্থোডক্স ঐতিহ্যে মূল ঈশ্বরতত্ত্ব হলো স্রষ্টার মহিমা বর্ণনার অতীত এক নীরবতা, যেখানে নিজের আত্মাকে পবিত্র করার মাধ্যমে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে হয়। এখানে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, মানুষ তার স্রষ্টা সম্পর্কে আসলে কিছুই জানে না এবং তাঁকে নিয়ে কল্পনা করা নিষেধ। একজন অর্থোডক্স খ্রিস্টান সব সময় স্রষ্টার অসীমত্বের সামনে নিজেকে একজন ‘মরমী অজ্ঞ’ হিসেবেই গণ্য করেন। এখানেই আমরা রোমান ক্যাথলিকদের চেয়ে আলাদা, যারা মনে করে তারা ঈশ্বরকে পুরোপুরি বুঝে ফেলেছে।

দ্বিতীয় শাখাটি হলো পরিত্রাণতত্ত্ব বা ‘ক্রিস্টোলজি’। এর মূল বিশ্বাস হলো—ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন এবং আমাদের মুক্তি চান। এটি মূলত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং স্রষ্টার বাণীর গভীর ধ্যানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। সন্ন্যাসীরা একে ‘স্রষ্টার বাণীর আত্মস্থকরণ’ বলে অভিহিত করেন।

আর তৃতীয় শাখাটিই হলো ‘এস্ক্যাটোলজি’ বা শেষ জামানা বিষয়ক জ্ঞান। এটি কেবল শেষ সময় নিয়ে গবেষণাই নয়, বরং এটি হলো আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা। এস্ক্যাটোলজির প্রধান সমস্যা হলো অতিরিক্ত ও মনগড়া ব্যাখ্যা। অনেক ভণ্ড নবী কেয়ামতের আলামত বা দাজ্জালের চিহ্ন খুঁজতে গিয়ে এই পবিত্র বিষয়টিকে একটি হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করেছেন। এর সঠিক পদ্ধতি হলো—পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মূল পাঠ্যের দিকে ফিরে যাওয়া এবং বিশেষ করে মসীহ বা যিশুর জীবন ও বাণীর ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া। যেহেতু শেষ জামানার ঘটনাপ্রবাহে মসীহ একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবেন, তাই তাঁর বলা কথাগুলোই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। ইনজিলে বা গসপেলগুলোতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে যিশু শেষ জামানা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি, কিন্তু আমরা দেখাব যে বিষয়টি আসলে তেমন নয়।

এসক্যাটোলজি এবং গসপেলে খ্রিস্টের প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা

ইঞ্জিল শরীফ, বিশেষ করে সেন্ট জনের (ইউহান্না) ইঞ্জিল হলো মূলত মূলনীতির কিতাব। এর প্রথম শব্দ গ্রিক ভাষায় 'ইন আর্কি' অথবা লাতিন ভাষায় 'ইন প্রিন্সিপিও' (যার অর্থ—শুরুতে বা আদিতে); যা এই কিতাবটি পড়ার বা বোঝার জন্য সঠিক চাবিকাঠি। এখানে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা এবং মসীহ-এর প্রতিটি বাণী একেকটি ধ্রুব মূলনীতি বহন করে, যার প্রয়োগ ও গুরুত্ব অসীম। আমাদের আলোচনার মূল বিষয় অর্থাৎ 'মসীহ-এর প্রত্যাবর্তন' এই চতুর্থ ইঞ্জিলের (সেন্ট জন) অষ্টম অধ্যায়ে ঠিক এভাবেই সুনিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

ঈসা (আ.) জৈতুন পাহাড়ে গেলেন। পরদিন খুব ভোরে তিনি আবার ইবাদতখানায় (মসজিদে) ফিরে এলেন এবং সব লোক তাঁর কাছে সমবেত হলো। তিনি সেখানে বসে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। তখন শাস্ত্রজ্ঞ এবং ফরীশীরা (তৎকালীন ধর্মীয় নেতারা) ব্যভিচারের দায়ে ধরা পড়া এক নারীকে তাঁর কাছে নিয়ে এল। তারা তাকে সবার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তাঁকে বলল, "হে গুরু, এই নারী ব্যভিচার করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছে। মূসা (আ.)-এর শরীয়তে আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই ধরনের নারীকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। এখন আপনি এ বিষয়ে কী বলেন?" তারা মূলত তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য এই প্রশ্ন করেছিল যাতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার কোনো সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু ঈসা (আ.) নিচু হয়ে মাটির ওপর আঙ্গুল দিয়ে লিখতে লাগলেন, যেন তিনি তাদের কথা শুনতে পাননি। তারা যখন বারবার তাঁকে একই প্রশ্ন করতে লাগল, তখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং তাদের বললেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো পাপ করেনি, সেই আগে একে প্রথম পাথরটি মারুক।" এই বলে তিনি আবার নিচু হয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন।

এই কথা শুনে তারা সবাই নিজ নিজ বিবেকের দংশনে লজ্জিত হয়ে একজন একজন করে সেখান থেকে চলে গেল। বয়োজ্যেষ্ঠদের থেকে শুরু করে একদম শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই চলে যাওয়ার পর সেখানে কেবল ঈসা (আ.) একা থাকলেন এবং সেই নারীটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। ঈসা (আ.) যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং সেই নারী ছাড়া আর কাউকে দেখলেন না, তখন তিনি তাকে বললেন, "হে নারী, তোমার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ এনেছিল তারা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দণ্ড দেয়নি?" সে উত্তর দিল, "না প্রভু, কেউ দেয়নি।" তখন ঈসা (আ.) তাকে বললেন, "আমিও তোমাকে দণ্ড দিচ্ছি না; তুমি যাও, আর কখনও পাপ করো না।"

যোহন ৮:১-১১

একজন সরল পাঠক আমি যে বর্ণনাটি তুলে ধরেছি তাতে ব্যভিচারে ধরা পড়া একজন নারীর গল্প দেখতে পাবেন। এই ঘটনাটি সত্যিই ঘটেছিল, এবং এটি প্রাথমিকভাবে একজন দুঃখী, পাপী নারীকে নিয়ে ঘটেছিল, যার নাম আমরা জানি না। তবুও, খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব ত্রিমুখী হওয়ায়, এখানে নৈতিক আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও, আমাদের অবশ্যই সত্তাগত অর্থ এবং এসক্যাটোলজিক্যাল তাৎপর্য খুঁজতে হবে।
এসক্যাটোলজিক্যাল তাৎপর্য, যা নিয়ে আমরা এখানে আগ্রহী, তা নিম্নরূপ: এই গল্পটি সময়ের শেষে খ্রিষ্টের প্রত্যাবর্তনের কথা বলে। জলপাই পর্বতে তাঁর স্বর্গারোহণের (প্রেরিতদের কার্য ১.৪-১২) পর, যিশু নতুন দিনের সকালে ফিরে আসবেন। তিনি জেরুজালেমে আসবেন এবং মন্দিরে বিচারকের আসনে বসবেন, এবং সমস্ত জাতি বিচারের জন্য তাঁর কাছে আসবে। তখন শয়তানরা, যারা আমাদের সমস্ত পাপ জানে এবং যাদের কাজ হলো আমাদের সেই পাপের জন্য অভিযুক্ত করা, তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। যিশু মাটিতে লেখেন। প্রথমবার তাঁর প্রথম আগমনের প্রতি ইঙ্গিত করে, যখন মেষশাবকের রূপে এসে তিনি নম্রতার সাথে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু শয়তানরা

এবং তাঁর লোকেরা তাঁর কথা শোনেনি। দ্বিতীয়বার তিনি শক্তি নিয়ে আসবেন, এবং অভিযোগকারীরা বাতাসের ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়বে। "বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত" এই সুনির্দিষ্ট কথাটির অর্থ কী? আমরা প্রতীকীভাবে প্রথমে শয়তানদের ("বয়োজ্যেষ্ঠ") এবং শয়তানদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী মানুষদের ("শেষ") চিহ্নিত করছি। খ্রিষ্টের চূড়ান্ত বাক্য "যাও, আর পাপ করো না" এর অর্থ কী? যদি আক্ষরিক ও নৈতিক অর্থে এটি এই মহিলাকে তার স্বামী এবং ঐশ্বরিক আইনকে সম্মান করার জন্য একটি দৃঢ় সুপারিশ, একটি আদেশ বোঝাতো, তবে এসক্যাটোলজিক্যাল পাঠে এই বাক্যটিকে সেই অনুগ্রহ হিসাবে বুঝতে হবে যা ঈশ্বর বেহেশতের যোগ্য মানুষকে দেবেন, এমন একটি অনুগ্রহ যা তাদের জন্য চিরকাল পাপহীন জীবন ধারণের সুযোগ করে দেবে।

খ্রিষ্টের প্রত্যাবর্তনের এই বর্ণনা শেখ ইমরান হোসেইন বছরের পর বছর ধরে যা ব্যাখ্যা করে আসছেন এবং যা কুরআনে পাওয়া যায়, তার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।

তবে আমি এখানে পাঠককে সুসমাচারে খ্রিষ্টের প্রত্যাবর্তনের অন্যান্য বর্ণনা খুঁজে দেখার জন্য উৎসাহিত করতে চাই। তাই আমি একটি বর্ণনা দিচ্ছি, যার সাথে অ্যান্টিক্রাইস্ট (দাজ্জাল) কেমন হবে তার ব্যাখ্যাও থাকবে।

আমরা সেন্ট ম্যাথিউ এর গসপেলের চতুর্থ অধ্যায়ে মরুভূমিতে যিশুর প্রলুব্ধ হওয়ার বিবরণ পাই। এই সম্পূর্ণ বর্ণনাটি ইবলিসের বিদ্রোহের কুরআনিক বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত। কুরআনে, আলোর ফেরেশতা, লুসিফার, ঈশ্বরের তার সামনে উপস্থাপন করা মানুষের সামনে নত হতে অস্বীকার করে। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রলুব্ধ হওয়ার বর্ণনায় আমরা সিজদার বিষয়টি খুঁজে পাই: এটি শয়তানই যিশুকে তার সামনে নত হওয়ার প্রস্তাব দেয় এবং শেষে আমরা দেখি ফেরেশতারা, শয়তান ব্যতীত, যিশুকে সেবা করতে আসছে। এখানে কুরআন এবং গসপেল কীভাবে একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মিলে যায় এবং পরিপূরক হয় তা বুঝতে পাঠকের একটু অন্তর্দৃষ্টি লাগবে।
আমি এই বিষয়ে আর কিছু বলব না। তবে, আমাকে এই বর্ণনার আমার এসকাটোলজিকাল ব্যাখ্যা দিতে দিন.

তারপর যিশুকে আত্মা দ্বারা মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো, যেন শয়তান তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে। আর যখন তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস করলেন, তখন তিনি ক্ষুধার্ত হলেন। আর যখন প্রলুব্ধকারী তাঁর কাছে এলো, সে বলল, "যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে আদেশ করো যেন এই পাথরগুলো রুটি হয়ে যায়।" কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, "লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটি দিয়ে বাঁচে না, বরং ঈশ্বরের মুখ থেকে নিঃসৃত প্রতিটি বাক্য দ্বারা বাঁচে।"তারপর শয়তান তাকে পবিত্র শহরে নিয়ে গেল এবং মন্দিরের চূড়ায় স্থাপন করল।এবং তাকে বলল,"যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নিজেকে নিচে ফেলে দাও; কারণ লেখা আছে, 'তিনি তোমার বিষয়ে তাঁর দূতদের আদেশ দেবেন, এবং তারা তোমাকে হাতে করে তুলে ধরবে, যেন কোনো সময় তোমার পা পাথরে আঘাত না পায়'।" যিশু তাকে বললেন,"আবারও লেখা আছে, 'তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করবে না'।" আবার, শয়তান তাকে একটি অত্যন্ত উঁচু পর্বতে নিয়ে গেল এবং তাকে বিশ্বের সমস্ত রাজ্য ও তাদের মহিমা দেখাল; এবং তাকে বলল, "এই সমস্ত কিছু আমি তোমাকে দেব, যদি তুমি নত হয়ে আমাকে পূজা করো।" তখন যিশু তাকে বললেন, "দূর হও, শয়তান! কারণ লেখা আছে, 'তুমি তোমার প্রভু

ঈশ্বরের উপাসনা করবে এবং কেবল তাঁরই সেবা করবে'।" তখন শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গেল, আর দেখো, দেবদূতেরা এসে তাঁর সেবা করল।

মথি ৪:১-১১

দাজ্জাল খ্রীষ্টের শাসনকে অনুকরণ করার চেষ্টা করবে, তার পবিত্রতাকে অপবিত্র করবে।

যখন দাজ্জাল আসবে, সে তিনটি প্রলোভনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে, প্রকাশ্যে শয়তানের সামনে নত হবে। তখন ঐশ্বরিক আত্মা তাকে এবং তার অনুসারীদের ত্যাগ করবে, সে ফেরেশতাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হবে, এবং গৌরবে খ্রীষ্টকে দেখলে তার জীবনের অবসান ঘটবে।

“দাজ্জালের আগমনের তিনটি ধাপ”

১. রুটির সেই অলৌকিক ঘটনা। সামষ্টিক পর্যায়ে সারা বিশ্ব প্রযুক্তিগত উপায়ে গোটা পৃথিবীর ক্ষুধা মেটানোর ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যাবে। এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে মিশে আছে এমন এক বস্তুবাদী চিন্তা, যাকে আমরা সমাজতন্ত্র এবং বিজ্ঞানবাদ হিসেবে চিনি। অন্যদিকে ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা দেখব, একদল বসতি স্থাপনকারী একটি অনুর্বর ভূমিতে গিয়ে দম্ভভরে দাবি করছে যে, তারা এই মরুভূমিকে একটি উর্বর বাগানে পরিণত করেছে। ইসরায়েল রাষ্ট্রের ইতিহাসে এটি মূলত ‘কিব্বুৎজ’ (kibbutz) সময়ের সাথে সম্পর্কিত। রোমান আইন বা ঔপনিবেশিক আইনের বিচারে একটি মরুভূমির কানুনী দখল বজায় রাখার জন্য সেখানে সম্পদের উৎপাদন বাড়িয়ে দেখানো জরুরি ছিল। কারণ ঔপনিবেশিক আইন অনুযায়ী, যে ব্যক্তি ভূমি থেকে সবচেয়ে বেশি সম্পদ আহরণ করতে পারে, ভূমির মালিকানা তাকেই দেওয়া হয়।

২. “নিজেকে নিচে নিক্ষেপ কর।” দাজ্জালের আগমনের দ্বিতীয় পর্যায় হলো—বিশ্বের পবিত্রতা নষ্ট করা, সর্বজনীন আধ্যাত্মিক শূন্যতা তৈরি এবং সকল নৈতিক মূল্যবোধকে ছুড়ে ফেলা। বিশ্বাস, ন্যায়বিচার, সৌন্দর্য, বিশ্বস্ততা, পরিবার, সম্প্রদায়, সম্মান এবং আমাদের জন্য মসীহ—যা একসময় সভ্যতার শিখরে ছিল, সেগুলোকে এখন ‘বর্বর’ এবং ‘সেকেলে’ বলে গণ্য করা হবে। ধর্মীয় নেতারা তখন কেবল সামাজিক সমস্যা এবং ব্যক্তিগত সুখ নিয়ে কথা বলবেন, যা আসলে এক ধরণের অন্তঃসারশূন্য বা ফাঁপা আধ্যাত্মিকতা। একই সময়ে, ইসরায়েল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বড় বড় রাব্বি বা ধর্মগুরুরা জায়নবাদ দ্বারা পথভ্রষ্ট হবেন; তারা একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের জন্য ধর্মগ্রন্থের

জ্ঞানকে অপব্যবহার করবেন। এই সময়ে সারা বিশ্বের ইহুদিরা ইসরায়েলে ফিরে আসার (আলিয়া) চেষ্টা করবে, কিন্তু তারা অ-ইহুদি জাতিগুলোর (গোয়িম) নিজস্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ এবং তাদের বিশ্বদর্শনকে বাধা দেবে। বুদ্ধিমত্তার ওপর এই নিয়ন্ত্রণ বা সেন্সরশিপই হলো তথাকথিত 'তথ্য প্রযুক্তির যুগ'-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩.তৃতীয় পর্যায়টি হলো—ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দের পথ বেছে নেওয়া, অন্যায়ের প্রতি উদাসীন থাকা এবং পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা ও বিভ্রমকে গ্রহণ করা। এই সময়কালকেই শেখ ইমরান 'প্যাক্স জুডাইকা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। জাতিগুলো কেবল নিজেদের আরাম-আয়েষ এবং ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য জায়নবাদী শক্তির কাছে মাথা নত করবে; বিনিময়ে তারা সারা বিশ্ব ঘুরে দেখার এবং পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করার প্রতিশ্রুতি পাবে।

সেই সময়ে পর্যটন হবে স্বাধীনতার সর্বোচ্চ প্রতীক, কিন্তু কেবল তারাই পর্যটক হতে পারবে যারা 'বিস্ট' বা পশুর চিহ্ন (দাজ্জালের চিহ্ন) গ্রহণ করেছে। ফরাসি লেখক নিকোলাস বোনাল দেখিয়েছেন যে, বাইবেল অনুযায়ী ইতিহাসের প্রথম পর্যটক হলো স্বয়ং শয়তান। 'আইয়ুব' (Job) এর কিতাবে শয়তান স্রষ্টাকে বলছে যে সে সারা বিশ্বে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল:

প্রভু শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" শয়তান উত্তর দিল, "পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে এবং এর ওপর দিয়ে পায়চারি করে এসেছি।"

(ইয়ুব ১:৭)

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমরা যদি ধর্মগ্রন্থের পাঠ্যকে রূপকভাবে বা আলঙ্কারিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি, তবে সেই ব্যাখ্যার একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি এবং সীমা থাকা জরুরি। খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে এই মাপকাঠি এবং সীমা হলো 'ক্যাথলিকিটি' বা সর্বজনীনতা, যাকে স্লাভিক ভাষায় 'সোবোরনোস্ট' বলা হয়।

আমরা তাদের সতর্ক করছি যারা 'ক্যাথলিক' শব্দটিকে কেবল একটি নাম বা পদবি হিসেবে ব্যবহার করে এবং নিজেদের একচ্ছত্রভাবে 'ক্যাথলিক' বলে দাবি করে; কারণ এটি একটি স্ববিরোধী কাজ। পশ্চিমা খ্রিস্টানরা যখন নিজেদের 'ক্যাথলিক' বলে, তখন তারা মূলত এই শব্দের প্রকৃত অর্থটিই বিকৃত করে ফেলে। 'ক্যাথলিক' শব্দের অর্থ

হলো— ‘সমগ্র’ বা ‘সবাই মিলে’। এটি মূলত একটি সম্মিলিত ঐকমত্য, যা একক কোনো ব্যক্তির ভুল সংশোধন করে এবং সত্যকে নিশ্চিত করে।

পশ্চিমা বিশ্বাসীদের কাছে সত্যের মাপকাঠি হলো একজন মাত্র মানুষ—রোমের পোপ, যাঁর কথাকে তারা অভ্রান্ত বা ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে বলে মনে করে। এমনকি কখনও কখনও পোপ একাই পুরো ‘ক্যাথলিক’ সত্তা হিসেবে গণ্য হন! এটি সত্যিই এক সীমাহীন অযৌক্তিকতা!

বিপরীতে, একজন অর্থোডক্স বিশ্বাসীর কাছে সত্যের মাপকাঠি হলো—পুরো সমাজ বা ভ্রাতৃসমাজ। যখন একজন ভাই নিজের মুখে সেই সত্য উচ্চারণ করে যা আমরা সবাই গ্রহণ করেছি, তখন অন্য ভাইয়ের দৃষ্টি বা সমর্থনই তাকে পূর্ণতা দেয়। একারণেই দাজ্জাল বা অ্যান্টি-ক্রাইস্ট অবশ্যই ‘একচোখা’ হবে; কারণ তার যে চোখটি নেই, সেটি আসলে ‘ভাই’ বা সঙ্গীর চোখ! (অর্থাৎ সে সম্মিলিত সত্য দেখতে পায় না)।

মসীহ-এর জীবনে সত্যের সাক্ষী এবং তাঁর মসীহ হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে এই ‘ভাই’-এর ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরই ভাই জন দ্য ব্যাপটিস্ট (হযরত ইয়াহইয়া আ.)। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, তিনি কোনোকালেই ‘খ্রিস্টান’ ছিলেন না। যখন তিনি মসীহ-এর হাতে দীক্ষিত হতে চেয়েছিলেন, তখন মসীহ তাঁকে এই বলে বিরত করেছিলেন:

"অতঃপর ঈসা (আ.) গালীল থেকে জর্ডান নদীতে ইয়াহইয়া (আ.)-এর কাছে এলেন তাঁর কাছে দীক্ষা (বাপ্তিস্ম) নেওয়ার জন্য। কিন্তু ইয়াহইয়া (আ.) তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমারই প্রয়োজন আপনার কাছে দীক্ষা নেওয়ার, আর আপনি এসেছেন আমার কাছে?' ঈসা (আ.) উত্তরে তাঁকে বললেন, 'আপাতত এভাবেই হতে দাও; কারণ এভাবেই আমাদের সমস্ত নেক কাজ বা ধার্মিকতা পূর্ণ করা উচিত।' তখন ইয়াহইয়া (আ.) তাঁর কথা মেনে নিলেন।"

(মথি ৩: ১৩-১৫)

এর অর্থ কী এবং কেন এটি আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ? আমরা বিশ্বাস করি যে প্রভু এমনটিই চেয়েছিলেন; কারণ এমন এক সময় আসবে যখন একজন বিশ্বাসী নিজ দেশে একাকী ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং সমাজহীন এক পৃথিবীতে বাস করবে। তখন

সে তার দূরবর্তী কোনো অচেনা ভাইয়ের দৃষ্টি ও বাণীর মাঝে স্রষ্টার ভালোবাসা এবং সত্য পথের সন্ধান পাবে।

একজন অর্থোডক্স বিশ্বাসীসহ যেকোনো সত্য অন্বেষণকারী আমাদের বন্ধু শেখ ইমরানের এই বইটি থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। তিনি এখানে একজন বিজ্ঞ বন্ধুর গবেষণালব্ধ কাজ খুঁজে পাবেন, যা তাঁর নিজের বিশ্বাসের সত্যতাকে নিশ্চিত করবে এবং আল্লাহর পথে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য ভালোবাসার এক নতুন দিশা দেবে। আমার নিজের কথা বলতে গেলে—লোকে যা-ই বলুক না কেন—পবিত্র কুরআনের যে আয়াতগুলোতে ঈসা (আ.)-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেখানে আমি অর্থোডক্স বিশ্বাসের বিরোধী কিছু খুঁজে পাইনি। এমনকি যেখানে ত্রিত্ববাদের (তিন সত্তায় এক ঈশ্বর) মতো বিষয় নিয়ে বাহ্যিক মতভেদ আছে বলে মনে হয়, সেখানেও আমি কোনো বিরোধ দেখি না। ঈশ্বর প্রজ্ঞাবান এবং তিনি জানেন তিনি কী করছেন। তিনিই সত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিপতি।

"ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করে এবং ধন্য তারা যারা এর কথাগুলো শোনে এবং এতে যা লেখা আছে তা হৃদয়ে ধারণ করে; কারণ সেই সময় অতি নিকটবর্তী।"

(প্রকাশিত বাক্য ১:৩)

আমিন

মুখবন্ধ

আমি ২০১৪-১৫ সালে মালয়েশিয়ায় থাকাকালীন এই বইটি লিখতে শুরু করি। কিন্তু পরবর্তীতে এর কাজ স্থগিত রাখি যখন বুঝতে পারি যে, এই বইটির বিষয়বস্তু সঠিকভাবে বোঝার জন্য পাঠকদের প্রস্তুত করতে হলে আরও কিছু বই আগে লেখা প্রয়োজন। সেই থেকে এ পর্যন্ত নিচের বইগুলো লেখা এবং প্রকাশিত হয়েছে:

- কুরআন ও নক্ষত্ররাজি—কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি;
- কুরআন ও চন্দ্র—কুরআন তিলাওয়াতের মাসিক পদ্ধতি;
- দাজ্জাল, কুরআন এবং আউয়াল আল-জামান;
- কুরআন, দাজ্জাল এবং আল-জাসাদ;
- কুরআনে কনস্টান্টিনোপল;
- কুরআন, মহাযুদ্ধ এবং পশ্চিম।

এই বইটির মূল শিরোনাম ছিল: *"সত্য মসীহ ঈসা (আ.) থেকে ভণ্ড মসীহ দাজ্জাল পর্যন্ত—ইসলামিক এস্ক্যাটোলজিতে একটি সফর।"* পরবর্তীতে আমি একে দুটি আলাদা বইয়ে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিই। এর প্রথমটি কুরআনে বর্ণিত 'মসীহ' এবং দ্বিতীয়টি কুরআনে বর্ণিত 'দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ'-এর ওপর ভিত্তি করে লেখা। প্রতিটি বইয়ের আলাদা নতুন শিরোনাম থাকবে।

২০২০ সালের করোনা ভাইরাসের লকডাউন এবং সব ধরণের ভ্রমণ বন্ধ থাকার সুযোগে আমি এই প্রথম বইটি শেষ করার কাজ হাতে নিই। আমি কৃতজ্ঞ যে বইটি আগে শেষ না হয়ে ঠিক এই সময়েই সম্পন্ন হয়েছে; কারণ যারা এই বইটির বিষয়বস্তু আরও গভীরভাবে বুঝতে চান, তারা উপরে উল্লিখিত বইগুলো পড়ে এখন অনেক বেশি উপকৃত হতে পারবেন। (উপরের সব বই এবং আমার অন্যান্য সব বই আমার ওয়েবসাইট www.imranhosein.org থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে অথবা অনলাইন বুকস্টোর www.imranhosein.com থেকে অর্ডার করা যাবে)।

যথারীতি আমার প্রিয় সিঙ্গাপুরীয় সহকারী হাসবুল্লাহ শাফিঈ হাদিসের আরবী পাঠ্য খুঁজে বের করা ছাড়াও বিভিন্নভাবে আমাকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করেছেন। আমি আবারও আমার প্রিয় ফরাসি ছাত্র গ্রেগোয়ারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যে প্রুফ-রিডিং কাজে অত্যন্ত দক্ষ। এই সুযোগে সে বইটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করার অনুমতিও চেয়েছে।

আল্লাহ তাদের উভয়কে বরকত দান করুন। আমীন।

ইমরান নযর হোসেন

রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান।

১৪৪২ হিজরি।

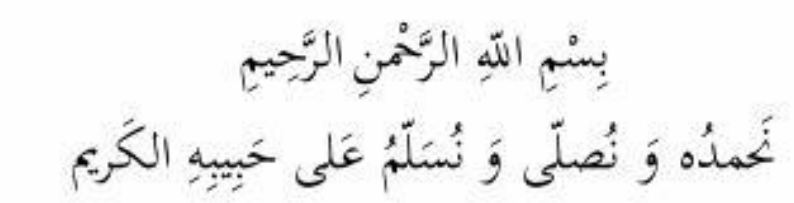

“পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।
আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

প্রারম্ভিক মন্তব্য

وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَٰلَمِينَ

“আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল, ‘হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন, পবিত্র করেছেন, এবং তোমাকে সমস্ত নারীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন।’”

সূরা: আলে ইমরান আয়াত: ৪২

এই বইটি এবং ইসলামিক এসকাটোলজি

এই বইটি লেখা ছিল ইসলামিক এস্ক্যাটোলজি বা শেষ জামানা বিষয়ক জ্ঞানের জগতে এক বিশাল ও অত্যন্ত শ্রমসাধ্য একটি কাজ। যেহেতু এই বইটি শেষ জামানার মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে, তাই একটি মাত্র বইয়ে এর প্রতিটি দিক এত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না যা একজন পাঠকের জ্ঞানের তৃষ্ণা পুরোপুরি মেটাতে পারে। একারণেই এই বইয়ে আলোচিত বিভিন্ন প্রসঙ্গের পর্যাপ্ত ও গভীর ব্যাখ্যার জন্য আমি বারবার আমার লেখা অন্যান্য বইগুলোর কথা উল্লেখ করেছি। এ ধরণের বিষয়গুলোর মধ্যে সবার আগে মাথায় আসে দাজ্জাল (ভণ্ড মসীহ) এবং ইয়াজুজ-মাজুজের কথা, যা আমার আগের বেশ কয়েকটি বইতে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কুরআন থেকে পাওয়া এই শেষ জামানা বিষয়ক জ্ঞান আমাদের গবেষণার এমন এক বিশেষ পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা বর্তমান বিশ্বকে বুঝতে এবং এর

চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য অপরিহার্য। এটি হলো হযরত খিজির (আ.)-এর (খিজির শব্দের অর্থ 'সবুজ') দেখানো গবেষণার সেই আদর্শ পথ, যাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি শেষ জামানায় সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হবেন:

বনী ইসরাঈলের জনগণের সামনে মূসা (আঃ) বক্তৃতা দিতে দাঁড়ান। তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, কে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী? তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। এতে আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হন। কেননা তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে জ্ঞানকে সম্পৃক্ত করেননি (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবচাইতে বড় জ্ঞানী এ কথা বলেননি)। আল্লাহ তা'আলা তার নিকট ওয়াহী পাঠান, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত এক বান্দা দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে আছে। সে তোমার চাইতে বেশি জ্ঞানী।

জামি' আত-তিরমিজি,

কুরআন খিজির (আঃ)-কে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছে, যিনি সরাসরি মহান আল্লাহর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং যাকে দয়া ও মমতা দান করা হয়েছিল। কুরআনের সূরা আল-কাহাফ নিশ্চিত করেছে যে, মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী সেই মানুষটিকে সেখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে দুই সমুদ্রের মিলন ঘটেছে। আমরা এর ব্যাখ্যা করি এভাবে যে— খিজির (আঃ) হলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার জ্ঞানের মাঝে বাহ্যিক উপায়ে অর্জিত জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকভাবে প্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের এক অপূর্ব ও সুষম সমন্বয় ঘটেছে।

এই লেখকের একজন অত্যন্ত প্রিয় অর্থোডক্স সার্বিয়ান খ্রিস্টান বন্ধু— যিনি এই বইটির চমৎকার ভূমিকা লিখেছেন— তিনি লেখকের কাছে মন্তব্য করেছেন যে, খিজির (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যগুলো অনেকটা মসীহ ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যের মতোই।

মহানবী (সা.) একবার তাঁর উম্মত বা অনুসারীদের বৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন:

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

আমার উম্মাত সেই বৃষ্টির মতো যার
প্রথম ভাগ না শেষ ভাগ বেশী ভালো তা জানা যায় না।

সুনান আত-তিরমিযি, ২৮৬৯

মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকে যে 'শেষ বৃষ্টির' সাথে তুলনা করেছেন, সেই শেষ সময়ের আলেম বা ধর্মীয় গবেষকরা ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারবেন না, যতক্ষণ না তারা দাজ্জাল (ভণ্ড মসীহ) এবং ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। কারণ শেষ জামানায় এরাই হলো বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। আমাদের সুনিশ্চিত মত হলো—হযরত খিজির (আ.)-এর সেই বিশেষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্বেষণের পথ অনুসরণ না করে কেউ কখনোই দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজের রহস্য বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

কেবল এই বিশেষ পদ্ধতির গবেষকরাই বর্তমানের তথাকথিত আধুনিক পশ্চিমা খ্রিস্টান সভ্যতার প্রকৃত বাস্তবতা চিনতে পারবেন। এই সভ্যতাকে মহান আল্লাহ তাঁর অবাধ্যতার কারণে শেষ পর্যন্ত 'বানরের মতো' (নিচু ও পশুতুল্য) জীবন কাটানোর অভিশাপ দিয়েছেন (দেখুন কুরআন, সূরা আল-আরাফ, ৭:১৬৬)। ইসলামিক এস্ক্যাটোলজি বা শেষ জামানা বিষয়ক জ্ঞানের চিরস্থায়ী গুরুত্ব এবং এটি পড়ার সঠিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা এখানেই।

যে সব বিশ্বাসী খ্রিস্টান যিশুকে মসিহ হিসেবে গ্রহণ করেছে

এই অধ্যায়ে কিছু প্রারম্ভিক আলোচনা করা হয়েছে, যা মসীহ-এর সন্ধানে আমাদের মূল যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করবে। খ্রিস্টানদের পাশাপাশি অন্য অনেকেই হয়তো এই বইটি পড়বেন এবং আশা করি তারা উপকৃত হবেন; তবে এই বইটি মূলত বিশ্বাসী খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে, যাতে তাদের কাছে কুরআনের আয়নায় মসীহ ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা যায়।

কুরআনের যে আয়াতটি উপরে উদ্ধৃত হয়েছে. যেখানে মারিয়াম (আ.)-কে ঐশ্বরিকভাবে বিশ্বের সকল নারীর ওপর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়াও এই বইটিতে পাঠকদের জন্য আরও অনেক আনন্দদায়ক বিস্ময় অপেক্ষা করছে। যেহেতু কুরআন তাঁকে 'ম্যারি' নয় বরং 'মারিয়াম' নামে অভিহিত করেছে, তাই প্রিয় পাঠকদের কাছে এই লেখকের বিনীত অনুরোধ, আপনারা যেন মারিয়াম (আ.) নামটির প্রতি আমার এই বিশেষ পছন্দটুকুকে গ্রহণ করেন।

কুরআন এটি নিশ্চিত করেছে যে, ঈসা (আ.)-ই হলেন সেই মসীহ যাঁর প্রতিশ্রুতি বনী ইসরাঈল বা ইসরায়েলিদের দেওয়া হয়েছিল। এই বইটি মূলত কুরআনের অকাট্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই এটি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, ঈসা (আ.) একদিন অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং জেরুজালেম থেকে পুরো বিশ্ব শাসন করবেন।

তবে তাঁর প্রত্যাবর্তনের আগে কুরআন একটি বিশেষ বিষয় প্রকাশ করেছে। তাহলো— মহান আল্লাহ তাঁর অনুসারীদের (যারা তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করে) এমন এক আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, যা তাঁকে অস্বীকারকারীদের ওপরে থাকবে। আর একবার যখন আল্লাহর ইচ্ছায় তারা এই অবস্থানে পৌঁছাবে, তখন কিয়ামত পর্যন্ত বা বিশ্বের শেষ দিন পর্যন্ত তারা সেই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবে:

اِذۡ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیۡسٰۤی اِنِّیۡ مُتَوَفِّیۡکَ وَ رَافِعُکَ اِلَیَّ وَ مُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَ جَاعِلُ الَّذِیۡنَ اتَّبَعُوۡکَ فَوۡقَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اِلٰی یَوۡمِ الۡقِیٰمَۃِ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرۡجِعُکُمۡ فَاَحۡکُمُ بَیۡنَکُمۡ فِیۡمَا کُنۡتُمۡ فِیۡهِ تَخۡتَلِفُوۡنَ

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, 'হে ঈসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে পরিগ্রহণ করব, তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব। আর যারা তোমার আনুগত্য করেছে তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপরে প্রাধান্য দেব। অতঃপর আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেব, যে ব্যাপারে তোমরা মতবিরোধ করতে' ।

সূরা আল ইমরান, আয়াত ৫৫

উপরের আলোচনা থেকে এটিই স্পষ্ট হয় যে, কুরআন এমন এক খ্রিস্টান জাতির কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যারা মহান আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকবে এবং একসময় তারা বিশ্বের প্রধান ও প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হবে। আর পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত তারা এই আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবে। আজ সেই মহাযুদ্ধের ঠিক আগমুহূর্তে বিশ্বে অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাশিয়ার যে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখছি, তা মূলত কুরআনের সেই ভবিষ্যদ্বাণীরই এক বিস্ময়কর বাস্তবায়ন।

যারা ঈসা (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে অস্বীকার করেছে

যে সব বনী ইসরাঈল ঈসা (আ.)-কে মসীহ হিসেবে অস্বীকার করেছিল, তারা আজও তাদের মসীহ-এর আগমনের আশায় দিন গুনছে। বর্তমানে জেরুজালেম দখল এবং পবিত্র ভূমিতে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের সেই আশা এখন আকাশচুম্বী হয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের বহিষ্কার করার এবং সেখানে ফিরে আসা নিষিদ্ধ করার প্রায় ২০০০ বছর পর, এই আধুনিক যুগে রক্তমাখা ও অন্যায় পথে তাদের সেই ফিরে আসার প্রকৃত রহস্য কী, তা এই বইয়ে কুরআনের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

আসলে একজন ভণ্ড মসীহ (দাজ্জাল) ইহুদিদের ধোঁকা দিয়ে এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে! এই বইয়ে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যখন ঈসা (আ.) ফিরে আসবেন এবং ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে, তখন কেন ওই পবিত্র ভূমি থেকে তাদের আবারও বিতাড়িত হওয়া অনিবার্য। বর্তমানে তারা যে সীমাহীন জুলুম চালাচ্ছে এবং সুলাইমান (আ.)-এর ইন্তেকালের পর থেকে ওই ভূমিতে বসবাসের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত শর্তগুলো বারবার লঙ্ঘন করছে, তারই শাস্তি হিসেবে তাদের এই বহিষ্কারের মুখোমুখি হতে হবে। মহান আল্লাহ আগেই সতর্ক করেছিলেন যে, তারা যদি কখনও এমন অন্যায় আচরণের মাধ্যমে পবিত্র ভূমিতে ফিরে আসে, তবে তিনিও তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করার কঠোর শাস্তি নিয়ে পুনরায় ফিরে আসবেন।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

“সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি আবার অনুগ্রহ করবেন; কিন্তু যদি তোমরা আবার (অন্যায় ও অবাধ্যতায়) ফিরে যাও, তবে আমরাও (শাস্তি নিয়ে) ফিরে আসব। আর অবিশ্বাসীদের জন্য আমরা জাহান্নামকে কারাগার বানিয়েছি।”

সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৮

মুসা (আঃ) নিপীড়িত ইসরায়েলিদের সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন, যেন তাদের নিশ্চিত করা যায় যে এমন একটি দিন আসবে যখন তারা নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবে:

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۗ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

মুসা (আঃ) তার জনগণের কাছে বললেন:
আল্লাহর সাহায্য গ্রহণ করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই পৃথিবী আল্লাহরই, এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর বান্দাদের মধ্যে এটি উত্তরাধিকার হিসেবে দেবেন। সাফল্যের চূড়ান্ত প্রতিফলন শুধুমাত্র ধার্মিকদের জন্য।

সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১২৮

এটা সত্যিই এক আজব ব্যাপার, যারা অতীতে অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল, আজ তারাই সবচেয়ে বড় অত্যাচারী হয়ে উঠেছে। সারা পৃথিবী সেই দিনের অপেক্ষায় আছে, যেদিন আল্লাহর ওয়াদা পূরণ হবে আর অত্যাচারিতদের জীবনে সুদিন ফিরে আসবে। আর সেই আলোকিত দিনে, ফ্রান্টজ ফ্যানন-এর সেই ঐতিহাসিক উক্তি অনুযায়ী, এই 'পৃথিবীর হতভাগ্যরা' হবে পবিত্র ভূমির প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

আমরা ঐ দিনটিকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করি না এমনই নির্যাতিতদেরও তা করা উচিত নয়, কারণ আল্লাহর সিদ্ধান্ত নিজস্ব সময়ে নিজভাবেই পরিপূর্ন হবে।

اَتٰٓى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ

আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে, অতএব এর জন্য তাড়াহুড়ো করো না।

সূরা আন-নাহল -এর প্রথম আয়াতের অংশ।

ইসলামে পবিত্র বিষয়াবলির সাহিত্যিক শিষ্টাচারের নীতি

ভাষা চিন্তা ও ধারণা প্রকাশের একটি মাধ্যম আর কিছু নয়; এই দিক থেকে ইংরেজি অন্য ভাষার চেয়ে আলাদা নয়। কিন্তু যখন ভাষাকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে চিহ্নিত করে এমন এক কাঠামো গ্রহণ করা হয় যা চিন্তাকে আড়াল বা সীমাবদ্ধ করে; এমনকি লেখককে ধর্মীয় বোধ বা পবিত্রতার প্রতি সম্মান কমিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রীতিনীতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য করে তখন ইসলামী পণ্ডিতদের উচিত সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে কণ্ঠ উঁচিয়ে প্রতিবাদ করা।

ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতায় পবিত্র বলে আর কিছুই টিকে নেই। পবিত্র যা কিছু ছিল, সবকিছুই এক অবিরাম ধর্মনিরপেক্ষ আবেশে অপবিত্র করা হয়েছে, যা একটি বিশ্বাসী হৃদয়ের উপলব্ধির বাইরে।

প্রায় পাঁচ শতাব্দী আগে, ১৫০১ থেকে ১৫০৪ সালের মধ্যে, তরুণ মাইকেলেঞ্জেলো নবী দাউদ (আঃ)-এর একটি মূর্তি খোদাই করেন যেখানে তাঁকে গলিয়াথের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়। ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা বিগত পাঁচশো বছর ধরে সেই ভাস্কর্যকে তাদের শিল্প-ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে। অথচ বিস্ময়ের বিষয়, কেউ কখনো ভাবেনি বা প্রশ্ন তোলেনি যে, আল্লাহ-প্রেরিত এক নবীকে সেখানে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়, তাঁর দেহ ও যৌনাঙ্গ প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যখন আদম ও হাওয়া জান্নাতে তাদের নগ্নতা সম্পর্কে সচেতন হলেন, তখন তারা গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢেকে নিলেন যেমনটি কুরআনে উল্লেখ আছে (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২২)। কিন্তু মাইকেলেঞ্জেলো, তার ধর্মনিরপেক্ষ হৃদয় নিয়ে, ডেভিডের নগ্নতা ঢাকার জন্য এমনকি একটি ডুমুর পাতাও খুঁজে পাননি। তাঁর হৃদয়ে পবিত্রতার প্রতি যে সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ থাকার কথা, তাও যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

যেখানে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা পবিত্রতাকে ত্যাগ করেছে, সেখানে বাইজান্টাইন খ্রিস্টান ও ইসলাম উভয়ই মহাবিশ্বকে দেখেছে এক পবিত্র আয়নায়,যার প্রতিফলনে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আধ্যাত্মিকতা তাদের সভ্যতার অন্তঃসার হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটেই আমরা এখন আমাদের খ্রিস্টান ও ইহুদি পাঠকবৃন্দসহ অন্যান্য অমুসলিমদের জন্য একটি ব্যাখ্যা পেশ করছি,যারা প্রভু-ঈশ্বরের নবীদের নামের পর যুক্ত আরবি শব্দগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য জানতে আগ্রহী হতে পারেন, যেমন: "ডেভিড, অর্থাৎ নবী দাউদ (আলাইহিস সালাম)"।
ব্যাখ্যাটি হলো, যখন প্রভু-ঈশ্বরের নাম, তাঁর নবীদের নাম, অথবা কুমারী মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর মতো সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের নাম উচ্চারিত বা লিখিত হয়, তখন ইসলামের সাহিত্যিক শিষ্টাচার অনুযায়ী তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা আবশ্যক। অতএব, এই লেখক সেই শিষ্টাচার সংরক্ষণ করতেই এমন বাক্যগঠন ব্যবহার করেছেন যদিও আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সাহিত্য ঐশ্বরিক সম্মানের এই প্রোটোকলগুলো অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে।

যখন আমরা প্রভু-ঈশ্বরের কোনো নবীর কথা উল্লেখ করি, তখন আমরা সর্বদা একটি প্রার্থনা করি: "তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!" এই লেখকের পছন্দ হলো সেই প্রার্থনা আরবি ভাষায় করা; এই কারণেই সুপ্রিয় পাঠক আল্লাহ তা'আলার নবীদের নামের পর ছোট ছোট আরবি শব্দবন্ধ দেখতে

পাবেন। যদিও যিশুর মা মারইয়াম (আঃ) নবী নন, কারণ প্রভু-ঈশ্বর কখনো কোনো নারীকে নবী হিসেবে নিযুক্ত করেননি, আমাদের সাহিত্যিক শিষ্টাচার হলো তার জন্যও প্রার্থনা করা। একইভাবে, আমরা আল্লাহকে 'সর্বোচ্চ' বা 'মহাজ্ঞানী' ইত্যাদি বলে উল্লেখ করি।

অবশেষে, এই লেখক মনে করেন যে কুরআনে আল্লাহ তা'আলার অলৌকিক, ঐশ্বরিকভাবে সংরক্ষিত বাণী অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব নয়; বরং, সর্বোচ্চ যা করা যেতে পারে তা হলো এর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা। তাই আমরা সবসময় কুরআনের আরবি পাঠ্য উদ্ধৃত করলেও, সেই পাঠ্যের নিচে যা কিছু উপস্থাপন করি তা হলো একটি ব্যাখ্যা, অনুবাদ নয়।

অধ্যায়: ১

ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে মসীহের প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত

وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا

"যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে অবতীর্ণ হবেন।

সহিহ আল-বুখারি,

উপরে উল্লিখিত নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কেবল এই নয় যে ঈসা (আঃ) একদিন ফিরে আসবেন, বরং যখন তিনি ফিরে আসবেন, তখন তিনি বিশ্ব শাসন করবেন। কুরআন আরও নিশ্চিত করে যে, মসিহের নেতৃত্বে একটি খ্রিস্টান জাতি বিশ্ব শাসন করার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে।

ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় পবিত্র রাষ্ট্র

কুরআন থেকে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা, যা আমাদেরকে এই বইয়ের বিষয়বস্তুর উৎস বুঝতে সাহায্য করে, তা শুরু হয়েছিল আল্লাহ ফেরেশতাদের কাছে এই ঘোষণার মাধ্যমে যে তিনি পৃথিবীতে একজন খলিফা অর্থাৎ একজন শাসক নিয়োগ করতে যাচ্ছেন। (কুরআন, আল-বাকারা, ২:৩০)। কুরআন পরবর্তীতে নির্দেশ দিয়েছে যে এই ধরনের শাসন অবশ্যই সত্যের উপর ভিত্তি করে হতে হবে এবং তাই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। (কুরআন, সাদ, ৩৮:২৬)

ফেরেশতারা তখন জিজ্ঞাসা করলেন:

..... أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ .....

"আপনি কি সেখানে এমন কাউকে স্থাপন করবেন যে তাতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে?"

সূরা আল-বাকারা ২:৩০

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই যে, ফেরেশতাগণ ওইরূপ উত্তর দিয়েছিলেন, কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে মানবজাতির উপর এক মিথ্যা শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ইতিহাসের যে রক্তক্ষয়ী ঘটনাবলী সংঘটিত হবে, তার কেবল আংশিক চিত্রই উন্মোচন করেছিলেন; কিন্তু সেই ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতি তাদের কাছে প্রকাশ করেননি। এই বইয়ের মূল ভিত্তি হলো কুরআনের সেই ব্যাখ্যা, যা বিশ্বের উপর ঐশ্বরিকভাবে নির্ধারিত একটি শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করে, যার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই শাসন ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা হবে সত্য ও ন্যায়বিচারের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

নিষিদ্ধ বৃক্ষের রহস্য

কুরআন ‘ফাসাদ’ (অর্থাৎ এমন কিছু যা কলুষিত ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে) সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত প্রদান করেছে, যা ইতিহাসে প্রকাশিত হবে, এবং যার প্রতি ফেরেশতারা তাদের পূর্বের প্রশ্নের মাধ্যমে সতর্ক করেছিলেন। এটি তখন ঘটেছিল যখন আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাতের বাগানে স্থাপন করেছিলেন, যেন তারা সেখানে নিরাপদে বসবাস করতে পারে। তবে একই সঙ্গে, আল্লাহ তাদের একটি নির্দিষ্ট গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ তা তাদের আচরণে মন্দ ও অন্যায়কারী করে তুলবে।

এই ঐশ্বরিক নির্দেশকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যায় না, কারণ কোনো গাছ মানুষকে কলুষিত করে না; বরং, এই গাছকে অবশ্যই একটি প্রতীক হিসেবে চিনতে হবে। আমাদের মতে, এটি মানবজাতির উপর এক মিথ্যা রক্তরঞ্জিত শাসনের প্রতীক ছিল, যাকে এই বইয়ে উপস্থাপিত প্রমাণের আলোকে আমরা প্যাক্স জুডাইকা (Pax Judaica) বলে চিহ্নিত করি। ফেরেশতাগণ যে ফাসাদ (বিশৃঙ্খলতা) এবং রক্তপাতের অভিযোগ করেছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ ইতিহাসের রক্তরঞ্জিত পাতায় বিদ্যমান। এই ফাসাদ ও রক্তপাত জেরুজালেম থেকে মানবজাতির উপর নিজেদের চিরস্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইহুদিদের এক মন্দ এবং দুঃখজনকভাবে পথভ্রষ্ট প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ঘটেছে।

এই লেখক নিষিদ্ধ বৃক্ষকে 'প্যাক্স জুডাইকা' (Pax Judaica) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, কারণ কুরআন শয়তান আদম (আঃ)-কে যা ফিসফিস করে বলেছিল তা প্রকাশ করেছে:

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ

"অতঃপর শয়তান তাকে প্ররোচিত করল, বলল, 'হে আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবন দানকারী বৃক্ষ এবং অবিনশ্বর রাজ্যের সন্ধান দেব?'"

সূরা তা-হা, আয়াত ১২০

সুতরাং, এটি ছিল এমন একটি বৃক্ষ যা চিরন্তনতা এবং এক অবিনশ্বর রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত। এই কারণেই নিষিদ্ধ বৃক্ষটি এমন এক শাসনের প্রতীক ছিল যা হবে চিরস্থায়ী। এখন সুপ্রিয় পাঠকের কাছে বিষয়টি বেশ পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, কুরআন আমাদের জন্য যথেষ্ট তথ্য দিয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা নিষিদ্ধ বৃক্ষটিকে বর্তমান ইসরায়েল রাষ্ট্রের সঙ্গে চিহ্নিত করতে পারি। এই রাষ্ট্রটি নিজেদেরকে দাউদ ও সুলাইমানের (আঃ) পবিত্র ইসরায়েল হিসেবে ঘোষণা করতে প্রস্তুত। এই ইসরায়েল রাষ্ট্রই, অন্য কোনো নয়, এমন এক শাসন দিয়ে বিশ্বকে শাসন করতে চায় যা কখনো বিলুপ্ত হবে না অর্থাৎ এক চিরন্তন শাসন! কুরআন সেই বৃক্ষ সম্পর্কে আরও তথ্য প্রকাশ করেছে এবং তা এমন চিত্রকল্পের মাধ্যমে করেছে যা ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন। এখানে আদম (আঃ) এবং তার স্ত্রী যখন সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে ফল খেলেন তখন কী ঘটেছিল তার তথ্য দেওয়া হলো:

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ

"অতঃপর তারা উভয়ে তা থেকে খেলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগল। আর আদম তার রবের অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রষ্ট হলো।"

সূরা তা-হা, আয়াত ২০:১২০

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ কীভাবে তাদের উভয়কে নিজেদের নগ্নতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলল, এবং তারপর বিনয়ের নিদর্শনস্বরূপ পাতা দিয়ে সেই নগ্নতা ঢাকতে প্ররোচিত করল? এই ঘটনাকে আক্ষরিক অর্থে বোঝা সম্ভব নয়; এই কারণেই লেখক এই ঘটনার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ, যা যৌন সম্পর্কের সাথে যুক্ত,তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করছেন।

বরং, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সেই বৃক্ষ থেকে খাওয়ার ফলে তাদের যে নগ্নতার সচেতনতা এসেছিল, তা নিষ্পাপতা হারানোর প্রতীক হিসেবে বুঝতে হবে; তাই আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে নিষিদ্ধ বৃক্ষটিকে লালসার সাথে সম্পর্কিত বলে ব্যাখ্যা করি চিরন্তন জীবনের লালসা এবং চিরন্তন শাসনের লালসা!

কুরআন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ইহুদিদের মধ্যে চিরন্তন জীবনের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা বা লালসা রয়েছে, তা প্রকাশ করেছে। এই বিষয়টি তখন আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন কুরআন তাদের সেই দাবির জবাব দেয় যে জান্নাত শুধুমাত্র তাদের জন্যই সংরক্ষিত।

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

"বলো, যদি আল্লাহর কাছে পরকালের আবাস কেবল তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, অন্য কোনো মানুষের জন্য নয়, তবে মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

সূরা আল-বাকারা ২:৯৪

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ

"কিন্তু তারা তাদের কর্মের (পাপের) কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আর আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।"

সূরা আল-বাকারা ২:৯৫

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ

"আর তুমি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবচেয়ে বেশি লোভী দেখতে পাবে এমনকি মুশরিকদের (মূর্তি পূজারী) চেয়েও। তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যে, যদি তাকে হাজার বছর আয়ু দেওয়া হতো! অথচ দীর্ঘায়ু পেলেও তা তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর আল্লাহ তারা যা করে সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"

সূরা আল-বাকারা (২:৯৬)

আমাদের পাঠকগণ এখন সেই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছেন যা আল্লাহ তা'আলা জানতেন কিন্তু ফেরেশতারা অবগত ছিলেন না অর্থাৎ, ইহুদি জাতির মধ্যে চিরন্তন জীবনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ্বকে চিরকাল শাসন করার লালসা তাদের পৃথিবীতে এক মন্দ ও অন্যায় শাসনে পরিচালিত করবে, যার অনিবার্য ফলস্বরূপ দুর্নীতি, ধ্বংস এবং রক্তপাতের মতো তিক্ত পরিণতি দেখা দেবে। তবে, আল্লাহর সৃষ্টি একটি নৈতিক শৃঙ্খলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এবং যেহেতু ইতিহাসের সূচনালগ্নে পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেহেতু ইতিহাসের শেষেও চূড়ান্তভাবে তা-ই জয়লাভ করবে।

ফেরেশতাদের ইতিহাসের এই পরিসমাপ্তি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না। ইতিহাসের সূচনালগ্নে যে ঘটনাবলী ঘটতে যাচ্ছিল, যা ইতিহাসের সমাপ্তির সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং ঐশ্বরিক ঘোষণার জন্য একটি ভবিষ্যৎবাণীমূলক যৌক্তিকতা প্রদান করত, সে সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন না।

হাজার হাজার বছর পর, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছায় নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষটি দেখালেন, যার কাছে যেতে আদম (আঃ)-কে নিষেধ করা হয়েছিল, এবং যাকে তিনি এখন কুরআনে 'একটি অভিশপ্ত বৃক্ষ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) সেই বৃক্ষটিকে একটি অলৌকিক দর্শনে দেখেছিলেন, যা তিনি সেই মহিমান্বিত রাতের যাত্রায় লাভ করেছিলেন যখন তাঁকে ইব্রাহিম (আঃ)-এর নির্মিত মক্কার পবিত্র মসজিদ থেকে সুলাইমান (আঃ)-এর নির্মিত জেরুজালেমের দূরবর্তী মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই অলৌকিক যাত্রা ইসরা ও মি'রাজ নামে পরিচিত।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَانِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَٰنًا كَبِيرًا

"আর যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, 'নিশ্চয় তোমার রব মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন', এবং যে দর্শন আমি তোমাকে দেখিয়েছিলাম তা শুধু মানুষের জন্য এক পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত গাছও। আমি তাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু তা তাদের চরম অবাধ্যতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

সূরা আল-ইসরাঃ আয়াত ৬০

কুরআনের সূরা আল-ইসরা এবং সূরা বনী ইসরাঈলএই দুটি নামে পরিচিত সূরার প্রথম আয়াতেই আমাদেরকে ইসরা ও মি'রাজের অলৌকিক যাত্রা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য ছিল এই ইঙ্গিত দেওয়া যে, ইসরা ও মি'রাজ নবীকে সেই ভয়াবহ পরিণতি (নরক) দেখিয়েছিল যা মানবজাতিকে ভোগ করতে হবে নিষিদ্ধ বৃক্ষের কারণে। অর্থাৎ, জেরুজালেম থেকে এমন এক চিরস্থায়ী রাজ্য দ্বারা বিশ্ব শাসন করার ইহুদিদের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তার ফলস্বরূপ মানবজাতির যে দুর্ভোগ নেমে আসবে, নবীকে তা দর্শন করানো হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা এরপর আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণ শাসনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন। আদম এই জ্ঞান লাভ করতে পেরেছিলেন (যা ফেরেশতারা পারেননি), কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐশ্বরিক রূহ (বা আত্মা) তাঁর মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলেন; ফলস্বরূপ, তিনি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার জ্ঞান গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন (কুরআন, আল-বাকারা, ২:৩১-৩২)। একই সাথে, তিনি স্বজ্ঞা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে 'অভ্যন্তরীণভাবে প্রাপ্ত' এবং 'বাহ্যিকভাবে অর্জিত' জ্ঞানকে একটি সুরেলা পূর্ণাঙ্গতায় একত্রিত করতেও সক্ষম ছিলেন।

উপরিউক্ত আলোচনার তাৎপর্য এই ছিল যে, পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণ শাসন কেবল তাদের দ্বারাই সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদম (আঃ)-কে শেখানো জ্ঞান এবং পরবর্তীতে ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থসমূহে প্রকাশিত জ্ঞান ধারণ করে। শুধুমাত্র সেই জ্ঞানই তাদের শাসন করার যোগ্য করে তুলতে পারে। অতএব, যার কাছে আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে আগত সেই জ্ঞান নেই এবং যিনি ফলস্বরূপ রাষ্ট্র পরিচালনায় সেই জ্ঞান প্রয়োগে অক্ষম, তিনি শাসন করার যোগ্য নন।

আল্লাহ তা'আলা এরপর নবী আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে শাসনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে বললেন এবং তিনি তা করলেন। (কুরআন, আল-বাকারা, ২:৩১-৩৩) উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মানবজাতিকে পৃথিবীতে স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ন্যায়পরায়ণ শাসন প্রতিষ্ঠা করা, এবং তা কেবল তারাই সম্পন্ন করতে পারে যারা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে প্রকাশিত জ্ঞান ও নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে এবং শাসন প্রতিষ্ঠার সময় অন্য কোনো উদ্দেশ্য অনুসরণ করে না। কুরআন সতর্ক করে দিয়েছে যে, যারা অন্যভাবে শাসন করবে,

কিয়ামত দিবসে তাদের এক ভয়ানক পরিণতি ভোগ করতে হবে (এই অধ্যায়ের পরে কুরআন, সাদ, ৩৮:২৬ দেখুন)।

ইতিহাসের শুরুতে ঘটা ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের শেষ মুহূর্তের সমান্তরালতা

কুরআন ঘোষণা করেছে যে আল্লাহই প্রথম এবং তিনিই শেষ, এবং তিনি সকল বিষয়ে অবগত। এর মাধ্যমে কুরআন একটি এসকাটোলজিক্যাল (ভবিষ্যতবাণী সংক্রান্ত) নাটকের উন্মোচন করেছে যা ইতিহাসে ঘটবে, তা হলো: ইতিহাসের শুরুতে যেমন ছিল, ইতিহাসের শেষেও ঠিক তেমনই হবে।

ইতিহাসের শেষে এমন এক নাটকীয় ঘটনা ঘটবে, যা ইতিহাসের শুরুর ঘটনার মতোই হবে। ইতিহাসের সেই শেষ সময়টা কেমন হবে, যা উপরে বর্ণনা করা ইতিহাসের শুরুর অংশের সাথে মিলবে?
কুরআনে যিশুর অলৌকিকভাবে ফিরে আসার অনেক স্পষ্ট প্রমাণ আছে। আর নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যে, মারইয়ামের পুত্র মসিহ যিশু (আঃ) আবার ফিরে আসবেন। তিনি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যিশু (আঃ) 'আল-হাকিম আল-আদিল' (অর্থাৎ একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক) হিসেবে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হওয়ার মাধ্যমেই ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে 'প্যাক্স দেই' (Pax Dei) বা 'ঈশ্বরের শান্তি' দিয়ে, যা দিয়ে ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় এর শুরু হওয়ার কথা ছিল।

وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا

"যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে অবতীর্ণ হবেন।

সহিহ আল-বুখারি,

এই একই ভবিষ্যদ্বাণী সামান্য ভিন্নভাবে অন্য স্থানেও বিদ্যমান।

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا وَإِمَامًا

"কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না মারইয়ামের পুত্র ঈসা (আঃ)একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম হিসেবে অবতীর্ণ হন।

সুনান ইবন মাজাহ

তবে, মনে রাখতে হবে যে ইতিহাসের শুরুটা ইতিহাসের শেষের সাথে আরেকটা মিল দেখিয়েছিল। এই মিলটা (আবারও তাদের 'ঈশ্বরের শান্তি'র নকল সংস্করণ তৈরি করার চেষ্টার মধ্যে) এমন কিছু মানুষের বৈশিষ্ট্যে পাওয়া যায়, যারা অহংকার করে শয়তান বা ইবলিসের মতো নিজেদের বাকি মানুষের চেয়ে বড় মনে করে। শয়তান বা ইবলিসের মতোই, তারাও দাবি করে যে তারা জন্মগতভাবে শ্রেষ্ঠ, কারণ তাদের বিশ্বাস, তাদেরকেই শ্রেষ্ঠ করে বানানো হয়েছে! সহজ কথায়, তারা দাবি করে যে প্রভু-ঈশ্বর শুধু তাদেরকেই নিজের বিশেষ জাতি হিসেবে বেছে নিয়েছেন, বাকি সব মানুষকে বাদ দিয়ে। তারা আরও দাবি করে যে তারাই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, কারণ তাদের মতে, প্রভু-ঈশ্বর তাদের উপর অনেক জ্ঞান দিয়েছেন, যেমনটা তিনি আদম (আঃ)-কে দিয়েছিলেন। আর তাই কেবল তারাই 'ঈশ্বরের শান্তি' প্রতিষ্ঠা করার যোগ্য। এমন আচরণ আসমানে বরদাশত করা হয়নি, আর এর ফলস্বরূপ ইবলিসকে আসমান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং তার ওপর আল্লাহর লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণা করেছিলেন যে, এমন অহংকারকে কঠিন আযাব (শাস্তি), লাঞ্ছনা এবং নিকৃষ্টতার মাধ্যমে দণ্ডিত করা হবে।

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ
وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

"অতএব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বৃদ্ধি করবেন। আর যারা অহংকার করেছে ও অবজ্ঞা করেছে, আল্লাহ তাদের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে দণ্ডিত করবেন; এবং তারা আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না।"

সূরা আন-নিসা, ৪:১৭৩

সুতরাং, ইতিহাসের শেষে যখন একই ধরনের অহংকার দেখা যাবে, তখন আল্লাহও ঠিক একইভাবে এর জবাব দেবেন, যেমনটা তিনি ইতিহাসের শুরুতে শয়তানের অহংকারের সময় দিয়েছিলেন।

পবিত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

কুরআনে ঐশ্বরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম খবর আমরা পাই নবী নূহ (আঃ)-এর আগমনের পর। ইতিহাসের শুরুতেই পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশিত শাসন প্রতিষ্ঠার যে কথা বলা হয়েছিল, তারই

বাস্তবায়নের ইঙ্গিত এখানে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর শাসকদের উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন। (কুরআন, আল-আ'রাফ, ৭:৬৯; ইউনুস, ১০:১৪; ১০:৭৩; আন-নামল, ২৭:৬২)। তবে, কুরআন আমাদেরকে এই বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি যে, তারা ঠিক কোন রাষ্ট্রের উপর শাসন করত (যদি এমন কোনো রাষ্ট্র থেকেই থাকে)।
এমন একটি রাষ্ট্রের বাস্তবায়নের প্রথম ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা কুরআনে পাই, যেখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে তিনি ইব্রাহিমের (আঃ) পরিবারকে একটি বিশাল রাজ্য দান করেছিলেন।

اَمۡ يَحۡسُدُوۡنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ۚ فَقَدۡ اٰتَيۡنَاۤ اٰلَ اِبۡرٰهِيۡمَ الۡكِتٰبَ وَ الۡحِكۡمَةَ وَ اٰتَيۡنٰهُمۡ مُّلۡكًا عَظِيۡمًا

বরং তারা কি লোকদেরকে হিংসা করে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে? তাহলে তো আমি ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি বিশাল রাজত্ব।

সূরা আন-নিসা, ৪:৫৪

কুরআনে ইব্রাহিমের (আঃ)পরিবারকে দেওয়া সেই ভবিষ্যৎ রাজ্যের প্রথম প্রমাণ হলো, ইউসুফ(আঃ)
তখন মিশরের রাজতন্ত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার আসনে ছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রার্থনা করেছিলেন যা তাকে দেওয়া হয়েছিল:

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِیْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِیْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ اَنْتَ وَلِيّٖ فِی الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِيْنَ

‘হে আমার রব, আপনি আমাকে কিছু রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন’।

সূরা ইউসুফ ১২:১০১

যখন ফেরাউন মিশরে ইসরায়েলিদের দাস বানিয়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলা মুসাকে (আঃ)
মিশরের দাসত্ব থেকে তাদের বের করে পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলেন, তখন ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোতে ভবিষ্যতের রাজ্যের একটা ইঙ্গিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা তখন যা প্রকাশ করেছিলেন তা নিচে দেওয়া হলো:

وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِی الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ

আর আমি চাইলাম সেই দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতা বানাতে, আর তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাতে।

সূরা আল-কাসাস, ২৮:৫

আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ে আরও উল্লেখ করেছেন যখন তিনি ঘোষণা করলেন:

وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ

আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।

সূরা আল-সাজদা ৩২:২৪

ইসরায়েলিরা প্রায় ৪০০ বছর আগে যে পবিত্র ভূমি ছেড়ে গিয়েছিল, সেখানে ফিরে আসার অল্প সময়ের মধ্যেই শক্তিশালী এক রাজ্যের জন্ম হয়েছিল।

ইব্রাহিমের (আঃ) বংশধরদের আল্লাহ যে বিশাল রাজ্যের ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন, কুরআন তা উল্লেখ করেছে। সেই রাজ্য ছিল ইসরায়েল রাষ্ট্র, যা পবিত্র ভূমিতে নবী দাউদ (আঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে সরাসরি ডেকে বলেছিলেন যে তিনি পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণ শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য মনোনীত হয়েছেন।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি করেছি, কাজেই তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসন-বিচার পরিচালনা কর, এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। কেননা, তা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য আছে কঠিন 'আযাব, কারণ তারা হিসাব-নিকাশের দিনকে ভুলে গেছে।

সূরা সোয়াদ, ৩৮:২৬

এটা অবশ্যই নবী দাউদ (আঃ) ছিলেন যিনি জেরুজালেমকে সেই পবিত্র রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ আদেশ দিয়েছিলেন যে নবী দাউদ (আঃ) প্রথম পবিত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। এছাড়াও, তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইব্রাহিমের (আঃ) বংশকে একটি বড় রাজ্য দেবেন, তা আল্লাহ পূরণ করেছেন। ফলে নবী সুলায়মান (আঃ)–এর সময় পর্যন্ত সেই রাজ্য শক্তিশালী হয়ে পৃথিবীতে একটি মহা-রাজ্য হিসেবে দাঁড়িয়েছিল।

وَ شَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ

আমি তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম, আর তাকে দিয়েছিলাম জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচক্ষণতা আর বিচারকার্য ও কথাবার্তায় উত্তম সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতা।

সূরা সোয়াদ, ৩৮:২০

পবিত্র রাষ্ট্র,পবিত্র ভূমি এবং ইসরায়েলি জাতি

কুরআন আমাদের জানিয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহিমকে (আঃ) ব্যবিলন থেকে একটি বিশেষ ভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বংশধররা সেই ভূমিতে বসতি স্থাপন করেছিল। আর সেই ভূমিতেই দাউদ (আঃ) ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পুত্র সোলায়মান (আঃ) সেই রাষ্ট্র থেকে বিশ্ব শাসন করেন।

... الأَرْضَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ...

...যে ভূমিকে আমরা বরকতপূর্ণ করেছি...

সূরা আল-আনবিয়া, ২১:৮১

... الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ...

...যার চারপাশ (মসজিদুল আকসা) আমরা বরকতময় করেছি...

সূরা আল-ইসরা, ১৭:১

... الأَرْضَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ...

...যে ভূমিকে আমরা বিশ্বজগতের জন্য বরকতপূর্ণ করেছি...

সূরা আল-আনবিয়া, ২১:৭১

নবী মুসা (আলাইহিস সালাম) এটিকে একটি 'পবিত্র ভূমি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন:

... يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ...

...হে আমার জাতি, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো...

সূরা আল-মাইদাহ ৫:২১

ইসরায়েলিরা প্রকৃতপক্ষে ইব্রাহিমের (আঃ) বংশধর ছিল তাঁর পুত্র ইসহাক (আঃ) এর মাধ্যমে, এবং ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব (আঃ) এর মাধ্যমে। কুরআন তাদের বনু ইসরাঈল নামে উল্লেখ করেছে। নিচের আয়াতে, যেখানে জাকারিয়া একটি পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, সেখানে আমরা নিশ্চিত

প্রমাণ পাই যে বনু ইসরাঈল নামটি তাদের দেওয়া হয়েছিল যারা ইয়াকুব (আঃ) থেকে তাদের বংশের সূত্র খুঁজে পেয়েছিল:

يَّرِثُنِیۡ وَ یَرِثُ مِنۡ اٰلِ یَعۡقُوۡبَ ۟ وَ اجۡعَلۡہُ رَبِّ رَضِیًّا

যে আমার উত্তরাধিকারী হবে আর উত্তরাধিকারী হবে ইয়া'কুব পরিবারের; আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে করুন আপনার সন্তুষ্টির পাত্র।

সূরা মারিয়ম ১৯:৬

পবিত্র কুরআন নিম্নোক্ত আয়াতে ইয়াকুব (আঃ)-এর জন্য 'ইসরাঈল' নামটি ব্যবহার করেছে। এর পেছনের কারণগুলো এই গ্রন্থের পরবর্তী একটি অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে:

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ

"যারা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত নবীদের মধ্যে আদমের বংশ থেকে, এবং যাদেরকে আমরা নূহের সঙ্গে বহন করেছিলাম, এবং ইব্রাহিমের বংশ থেকে, এবং ইস্রায়েলের বংশ থেকে।"

সূরা মারইয়াম ১৯:৫৮

কুরআনের উপরের প্রমাণগুলো নিশ্চিত করে যে বনু ইসরাঈল বা ইসরায়েলি জাতি ইব্রাহিমের পরিবারভুক্ত ছিল এবং সেই বরকতময় ও পবিত্র ভূমিতে তাদেরই পবিত্র রাষ্ট্র বা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে তাওরাতে বলা হয়েছে যে পবিত্র ভূমি তাদের এমনভাবে দেওয়া হয়েছিল যেন এটি কেবল তাদেরই জমি। তারা তাওরাত থেকে বুঝেছিল যে পবিত্র ভূমির ওপর একমাত্র তাদেরই অধিকার আছে। তাই তারা বিশ্বাস করত যে এই ভূমি শুধুই তাদের, আর কারো নয়।

এখন আমরা কুরআনের সাহায্যে যাচাই করব যে পবিত্র ভূমির ওপর ইহুদিদের এই একচেটিয়া মালিকানার দাবি কতটা সঠিক। কুরআন নিশ্চিত করেছে যে এই ভূমি তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল:

یٰقَوۡمِ ادۡخُلُوا الۡاَرۡضَ الۡمُقَدَّسَۃَ الَّتِیۡ کَتَبَ اللّٰہُ لَکُمۡ وَ لَا تَرۡتَدُّوۡا عَلٰۤی اَدۡبَارِکُمۡ فَتَنۡقَلِبُوۡا خٰسِرِیۡنَ

‘হে আমার কওম, তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন এবং তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যেয়ো না, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে’।

সূরা আল-মাইদাহ ৫:২১

আমাদের এখন এটা খুঁজে বের করতে হবে: সেই ভূমিতে তাদের জন্য কী নির্ধারণ করা হয়েছিল? কুরআন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে, প্রথমেই বলেছে যে, সেই ভূমি তাদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

وَ لَقَدۡ بَوَّاۡنَا بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ مُبَوَّاَ صِدۡقٍ وَّ رَزَقۡنٰهُمۡ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ۚ فَمَا اخۡتَلَفُوۡا حَتّٰی جَآءَهُمُ الۡعِلۡمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ یَقۡضِیۡ بَیۡنَهُمۡ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ فِیۡمَا كَانُوۡا فِیۡهِ یَخۡتَلِفُوۡنَ

আমি বানী ইসরাঈলকে মর্যাদাপূর্ণ আবাসস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম আর তাদেরকে উত্তম রিযক দিয়েছিলাম। অতঃপর তাদের কাছে (আল্লাহর প্রেরিত) সঠিক জ্ঞান আসার পূর্ব পর্যন্ত তারা মতভেদ করেনি। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছিল কিয়ামাত দিবসে তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তা মীমাংসা করে দিবেন।

সূরা ইউনুস আয়াত ৯৩

ফেরাউন ও তার সৈন্যদের হাত থেকে ইসরায়েলিদের অলৌকিকভাবে বাঁচানোর পর, যেমন সমুদ্র ভাগ করে দিয়ে ফেরাউন ও তার সৈন্যদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এরপর কুরআন আবারও সেই একই কথা বলেছে। আল্লাহ তায়ালা তখন তাদের পবিত্র ভূমিতে গিয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

وَّ قُلۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهٖ لِبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اسۡكُنُوا الۡاَرۡضَ فَاِذَا جَآءَ وَعۡدُ الۡاٰخِرَةِ جِئۡنَا بِكُمۡ لَفِیۡفًا

(তারা নিরাপদে সমুদ্র পার হওয়ার পর) আমরা ইসরায়েলি জাতিকে বললাম: "এখন তোমরা নিশ্চিন্তে এই ভূমিতে (অর্থাৎ পবিত্র ভূমিতে) বসবাস করো। কিন্তু মনে রেখো, যখন শেষ দিনের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন আমরা তোমাদের এক মিশ্র জনতা হিসেবে বের করে আনব।"

সূরা আল-ইসরা, আয়াত ১০৪

কুরআন এরপর স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, এই ভূমি তাদের উত্তরাধিকার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল।

وَ اَوۡرَثۡنَا الۡقَوۡمَ الَّذِیۡنَ کَانُوۡا یُسۡتَضۡعَفُوۡنَ مَشَارِقَ الۡاَرۡضِ وَ مَغَارِبَہَا الَّتِیۡ بٰرَکۡنَا فِیۡہَا ؕ وَ تَمَّتۡ کَلِمَتُ رَبِّکَ الۡحُسۡنٰی عَلٰی بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ ۬ۙ بِمَا صَبَرُوۡا ؕ وَ دَمَّرۡنَا مَا کَانَ یَصۡنَعُ فِرۡعَوۡنُ وَ قَوۡمُہٗ وَ مَا کَانُوۡا یَعۡرِشُوۡنَ

আর আমি দুর্বল করে রাখা লোকেদেরকে সেই যমীনের পূর্বের আর পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম যাতে আমি কল্যাণ নিহিত রেখেছি। এভাবে বানী ইসরাঈলের ব্যাপারে তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে তোমার প্রতিপালকের কল্যাণময় অঙ্গীকার পূর্ণ হল আর ফির'আওন ও তার লোকজনের গৌরবময় কাজ ও সুন্দর প্রাসাদগুলোকে ধ্বংস করে দিলাম।

সূরা আল-আরাফ আয়াত ১৩৭

এখন আমাদের জন্য এটি সুস্পষ্ট করা আবশ্যক যে,পবিত্র ভূমি কখনোই কেবল ইসরায়েল জাতির জন্য চিরস্থায়ী হিসেবে দেওয়া হয়নি। এবং এই ধারণাটি পুরোপুরি ভুল যে, বাকি সব মানুষকে বাদ দিয়ে এই ভূমি কেবল তাদেরই অধিকারে থাকবে। বরং, কুরআন এ বিষয়ে আরও একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে। সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, আল্লাহ পবিত্র ভূমিতে তাঁর সকল বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য বরকত রেখেছেন, কোনো নির্দিষ্ট জাতির জন্য নয়।

وَ نَجَّیۡنٰہُ وَ لُوۡطًا اِلَی الۡاَرۡضِ الَّتِیۡ بٰرَکۡنَا فِیۡہَا لِلۡعٰلَمِیۡنَ

আর আমি তাকেও (তার ভ্রাতুষ্পুত্র) লূতকে উদ্ধার করে তাদেরকে এমন দেশে (অর্থাৎ ফিলিস্তিনে) নিয়ে গেলাম যা আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণময় করেছি।

সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ৭১

আমরা প্রথম যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তা হলো, হলো ইহুদিদের যে ধারণা, আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র ভূমি শুধুমাত্র ইসরায়েলি জাতির জন্য চিরস্থায়ী মালিকানা হিসেবে দিয়েছেন এবং অন্য সব ঈমানদারদের বাইরে রেখেছেন, তা সম্পূর্ণ ভুল। পবিত্র ভূমি শুধুমাত্র তাদেরই ছিল না, বরং সেই ভূমি অন্যান্য ঈমানদারদের জন্যও বরকতপূর্ণ ছিল, যারা প্রভু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং সৎ জীবনযাপন করে।

পবিত্র ভূমির প্রতিশ্রুতি শর্তযুক্ত না শর্তহীন?

ইহুদিরা তাওরাতকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যেন, পবিত্র ভূমি বনী ইসরাঈলকে শর্তহীনভাবেই প্রদান করা হয়েছিল; অর্থাৎ, তাদের আচরণ ধার্মিক হোক বা অধার্মিক, তারা সত্যের প্রতি অনুগত থাকুক বা না থাকুক, এই ভূমি সর্বদাই তাদের অধিকারে থাকবে। তাওরাতের এই অদ্ভুত ঘোষণার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি ঠিক এমনই।

সুতরাং জেনে রাখো যে, তোমাদের ধার্মিকতার কারণে সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর
তোমাদেরকে এই উত্তম ভূমি অধিকার করতে দেননি;
কারণ তোমরা এক অবাধ্য জাতি।

(দ্বিতীয় বিবরণ: ৯:৬)

কুরআন ইহুদি এই বিশ্বাসের মিথ্যাচার উন্মোচন করেছে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র ভূমিতে বসবাসের জন্য ঈমান এবং ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের শর্ত নির্ধারণ করেছেন:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ

আমি যাবুরে উপদেশের পর ঘোষণা করেছি যে, আমার নেককার বান্দারাই এই ভূমির উত্তরাধিকারী হবে (এবং এর ফলে এখানে বসবাসের অধিকার লাভ করবে)।

সূরা আল-আম্বিয়া আয়াত ১০৫

পৃথিবীর অন্য কোথাও (উপরে উল্লিখিত) এই ঐশ্বরিক বিধানটির এমন সুস্পষ্ট প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়নি, যেমনটি হয়েছে পবিত্র ভূমিতে। কারণ, পবিত্র কুরআন আরও প্রকাশ করেছে যে, যখনই বনী ইসরাঈল পবিত্র ভূমিতে বসবাসের শর্তাবলী লঙ্ঘন করেছে, মহামহিম আল্লাহ তখনই তাদেরকে সেই ভূমি থেকে বহিষ্কার করেছেন। বস্তুত, সূরা আল-ইসরা-তে (নিম্নে উদ্ধৃত ১৭:৪-৭) কুরআন বনী ইসরাঈলের এই ধরনের দুটি সীমালঙ্ঘনের সময়কালকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে যে, উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পবিত্র ভূমি থেকে বহিষ্কার করেছিলেন।

وَقَضَيْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

"আমরা বনী ইসরাঈলকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছিলাম যে তারা পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় ঘটাবে এবং অত্যন্ত অহংকারী হয়ে উঠবে (কিন্তু তারা আমাদের সতর্কবার্তা শোনেনি)।"

وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

অতঃপর, যখন তোমাদের প্রথম দুষ্কর্মের সময় উপস্থিত হলো (যেমনটি আমরা পূর্বেই সতর্ক করেছিলাম) তখন আমরা তোমাদের উপর শাস্তি কার্যকর করলাম। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমাদের কিছু বান্দাকে, যারা ছিল যুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী ও ভয়ংকর ক্ষমতার অধিকারী।
তারা তোমাদের ভূমিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল,এবং এভাবেই আমাদের শাস্তির সতর্কবাণী বাস্তবায়িত হলো।(ফলস্বরূপ, ইসরায়েলীরা পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়িত হয় এবং বাবিলনে বন্দিত্বে আবদ্ধ করা হয়েছিল।)

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

"কিন্তু কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, আমরা তোমাদেরকে আবারও তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার সুযোগ দিলাম (এবং পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসে বসবাস করার জন্য), আর আমরা তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে [আগের চেয়েও] অধিক সংখ্যক করলাম।"

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

"আর আমরা তোমাদেরকে আবারও উপদেশ দিয়েছিলাম, পূর্ববর্তী সতর্কবাণী ছাড়াও: 'যদি তোমরা ভালো কাজ করো, তবে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ভালো করবে;

আর যদি মন্দ কাজ করো, তবে তার ফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।' আর তাই, যেমন আমরা সতর্ক করেছিলাম, যখন দ্বিতীয় বিপর্যয়ের সময়কাল উপস্থিত হলো, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আবারও এমন লোকদের পাঠালাম যারা তোমাদেরকে এমন ভয়ানক উপায়ে শাস্তি দিল যা তোমাদের জন্য অপমান নিয়ে আসল, এবং তারা মসজিদে (বা সুলাইমান কর্তৃক নির্মিত মন্দিরে) প্রবেশ করে ধ্বংস করে দিল, যেমনটি আগের বারে ঘটেছিল, এবং তারা যা কিছু জয় করেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিল।"

সুরা আল-ইসরা' ১৭:৪-৭

ইসরায়েলিদের পবিত্র ভূমিতে দুটি ফ্যাসাদের সময়কাল এবং ফলস্বরূপ সেই ভূমি থেকে তাদের দুইবার বহিষ্কারের বর্ণনা দেওয়ার পর যদিও সেই ভূমি তাদের বসবাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল কুরআন তাদের জানিয়েছে যে, তাদের জন্য অনুগ্রহের দরজা তখনও খোলা ছিল। তবে, তাদের সতর্ক করা হয়েছিল যে, যদি তারা অসৎ আচরণ নিয়ে পবিত্র ভূমিতে ফিরে আসে, তবে সেই ভূমি থেকে তাদের আবার বহিষ্কার করা হবে...

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

"আশা করা যায় তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু যদি তোমরা (ফ্যাসাদের দিকে) ফিরে যাও, তবে আমরাও ফিরে যাবো (শাস্তি দিতে)। আর জাহান্নামকে আমরা কাফেরদের জন্য এক সংকীর্ণ কারাগার বানিয়েছি।"

সূরা আল-ইসরা' ১৭:৮

কুরআনের উপরের আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বনী ইসরাঈলকে পবিত্র ভূমি দান করা হয়েছিল তাদের ঈমান ও সৎকর্মের শর্তে; তাই পবিত্র ভূমির প্রতি তাদের নিঃশর্ত ঐশী অনুদানের ইহুদি বিশ্বাস মিথ্যা। এই ধারণাটি যে মিথ্যা, তার আরও প্রমাণ ইতিহাসের শেষ প্রান্তে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে, যখন তারা শেষবারের মতো পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকারের শর্ত লঙ্ঘন করবে এবং এই বইটি লেখার সময় তাদের আচরণ ঠিক তেমনই; কিন্তু এবার তাদের বিতাড়িত করার পরিবর্তে, তাদের ধ্বংস করা হবে।

এই বইটি আধুনিক যুগে জেরুজালেম এবং পবিত্র ভূমিতে ইহুদিদের একটি মন্দ ও রক্ত রঞ্জিত প্রত্যাবর্তনের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করে এবং এর পাশাপাশি, ইতিহাসের শেষে সেই পবিত্র ভূমিতে তাদের অনিবার্য ঐশ্বরিকভাবে নির্ধারিত ধ্বংসের বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে। পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকারের জন্য ঈমান ও সৎ আচরণের ঐশী শর্ত লঙ্ঘনের ফলস্বরূপ তারা ধ্বংস হবে।
কুরআনে স্পষ্ট বলা আছে যে, যদি কোনো শহর (যেমন জেরুজালেম) এ খারাপ কাজ চলতে থাকে এবং সেখানকার দুর্বল মানুষেরা খুব অসহায় হয়ে পড়ে, তাহলে বিশ্বাসীদের উচিত এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।'

সূরা নিসা আয়াত ৭৫

যখন এই বইটি লেখা হচ্ছে, তখন মুসলিম দেশগুলোর বেশ কিছু সরকার কুরআনের সেই আহবানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, যা তাদের নিপীড়িতদের মুক্ত করার জন্য জেগে উঠতে এবং সংগ্রাম করতে অনুরোধ করে। তারা জেগে ওঠার পরিবর্তে হয় ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্র হয়েছে, অথবা অত্যাচারীর সামনে নতজানু হয়ে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিচ্ছে।

যখন মুমিনরা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে জেগে উঠবে এবং ফিলিস্তিনকে অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবে, তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টে যাবে:

حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّ اَقَلُّ عَدَدًا

অবশেষে যখন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, যে সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছিল। তখন তারা জানতে পারবে যে, সাহায্যকারী হিসেবে কে অধিকতর দুর্বল এবং সংখ্যায় কারা সবচেয়ে কম।

সূরা আল-জিন আয়াত ২৪

যখন জেরুজালেমকে অত্যাচার থেকে মুক্ত করার চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করে দিয়েছেন যে কোনো আপস, যুদ্ধবিরতি বা অস্ত্রবিরতির সুযোগ থাকবে না। বরং, যারা স্বাধীনতার জন্য লড়বে তাদের বিরুদ্ধে যতই প্রতিকূলতা থাকুক না কেন, তিনি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

فَلَا تَهِنُوْا وَ تَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَ اللّٰهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ

অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না ও সন্ধির আহবান জানিও না এবং তোমরাই প্রবল। আর আল্লাহ তোমাদের সাথেই রয়েছেন এবং কখনই তিনি তোমাদের কর্মফল হ্রাস করবেন না।

সূরা মুহাম্মদ আয়াত ৩৫

সবশেষে, কুরআন ইসরায়েলি জাতিকে এক দারুণ বার্তা দিয়েছে যে, সেই সময় ইতিহাস নিজেই পুনরাবৃত্তি করবে। ঠিক যেমনভাবে দুর্বল ও অসহায়রা আল্লাহর ইচ্ছায় মিশরের ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছিল এবং আবারও পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকারী হয়েছিল, তেমনি দুর্বল ও অসহায় মুমিনরাও ভুয়া ইসরায়েল রাষ্ট্রের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবে, এবং তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় তারাই পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকারী হবে।

وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ

কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, সেইসব মানুষের উপর আমাদের অনুগ্রহ বর্ষণ করি যাদেরকে জমিনে খুবই দুর্বল মনে করা হয়েছিল, এবং তাদের ইমানের অগ্রদূত বানাই, আর তাদের পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকারী করি।

সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৫

সেইসব ইহুদিদের জন্য যে পরিণতি অপেক্ষা করছে, যারা ফেরাউনের মতো অত্যাচারী, এবং যারা ফেরাউনের মতোই সত্যকে জেদ ও অহংকার করে প্রত্যাখ্যান করছে অর্থাৎ ঈসা মসিহ (আঃ) যে একজন মসিহ, এই সত্যকে মানে না তাদের পরিণতিও ফেরাউনের মতোই হবে। সেই পরিণতি কী ছিল?

যখন ফেরাউনের জন্য নির্ধারিত ভাগ্য এসে উপস্থিত হলো এবং সে সমুদ্রে ডুবতে শুরু করল, তখন সত্য তার সামনে এমনভাবে উদ্ভাসিত হলো যে সে তা অস্বীকার করতে পারল না। মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে সে ইসরায়েলি জাতির প্রভুর প্রতি নিজের বিশ্বাস ঘোষণা করল। কিন্তু সেই ঘোষণার প্রতি আল্লাহর ঐশ্বরিক প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, তখন আর তার জন্য মুক্তির কোনো সুযোগ অবশিষ্ট ছিল না। বরং, আল্লাহ্ তায়ালা সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ফেরাউনের দেহকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হবে যাতে তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক চিরস্থায়ী নিদর্শন হয়ে থাকে।

এই নিদর্শনের শিক্ষা হলো যারা ফেরাউনের মতোই ঔদ্ধত্য, অবিচার ও দুষ্টতার পথে চলবে, তাদের পরিণতিও ফেরাউনের মতোই হবে; তারা একইরকমভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে যেভাবে ফেরাউন ধ্বংস হয়েছিল।

وَ جٰوَزْنَا بِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُوْدُهٗ بَغْیًا وَّ عَدْوًا ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম আর ফির'আওন ও তার সৈন্য সামন্ত ঔদ্ধত্য ও সীমালঙ্ঘন ক'রে তাদের পেছনে ছুটল, অতঃপর যখন সে ডুবতে শুরু করল তখন সে বলল, 'আমি ঈমান আনছি যে, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই যাঁর প্রতি বানী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

সূরা ইউনুস, আয়াত ৯০

آٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ

[আল্লাহ্ বললেন:] "এখন? অথচ এর আগে তুমি তো ছিলে অবাধ্য এবং ছিলে ফাসাদ (অশান্তি ও ধ্বংস) সৃষ্টিকারীদের একজন!"
(এই ঐশ্বরিক উত্তর স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে, ফেরাউনের ঈমান ঘোষণা এসেছিল অনেক দেরিতে এমন এক মুহূর্তে, যখন আর তা গ্রহণযোগ্য ছিল না।)

সূরা ইউনুস, আয়াত ৯১

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۗ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ

"আজ আমি তোমার দেহকে সংরক্ষণ করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য এক সতর্কতামূলক নিদর্শন হয়ে থাকো। কিন্তু মানুষের অধিকাংশই আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে উদাসীন।"

সূরা ইউনুস, আয়াত ৯২

বর্তমান ইসরায়েল রাষ্ট্রের অবিরাম নিপীড়ন এবং সত্যের প্রতি তাদের একগুঁয়ে অস্বীকারে যারা সহযোগী বা সমর্থক, তাদের প্রতি কুরআনের কঠোর ও ভয়াবহ সতর্কবার্তা হলো নিম্নরূপঃ

"তোমরা আজ সেই জীবন যাপন করছো, যেভাবে একদিন ফেরাউন করেছিল আর তোমরাও অবধারিতভাবে মরবে ঠিক তার মতো করেই।ফেরাউন যখন লোহিত সাগরে ডুবে যাচ্ছিল, তখনও সে নিজের বিজয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল; সে ভাবত, তার শক্তি তাকে কখনো পরাজিত করবে না। ঠিক তেমনি, ইসরায়েলের ইহুদিরা শেষ সময় পর্যন্ত নিজেদের সাফল্যে আত্মবিশ্বাসী থাকবে যতক্ষণ না সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ফিরে আসবেন, আর তাদের ভ্রান্ত অহংকারকে সমুদ্রের মতো গ্রাস করবেন।"

যখন এই বইটি রচিত হচ্ছে, তখন আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশ বছরের দীর্ঘ, নিষ্ঠুর এবং অন্যায় দখলদারিত্ব সত্ত্বেও তারা আফগান জনগণকে দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকার এই পশ্চাদপসরণ অবধারিতভাবে এমন এক পরিণতি ডেকে আনবে, যেখানে আফগানিস্তানে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী আমিরাত যেমনটি হয়েছিল সোভিয়েত বাহিনীর পরাজয়ের পর। এভাবেই আল্লাহর ঐশ্বরিক পরিকল্পনা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পবিত্র ভূমি শেষ পর্যন্ত মুক্ত হবে, নির্যাতন ও অন্যায়ের দখলদারদের হাত থেকে। নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, খোরাসান থেকে এক অপ্রতিরোধ্য বাহিনী বের হব, যা পবিত্র ভূমিকে দখলদার ও অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্ত করবে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আল্লাহর এই ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা এবং সেই মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে।

পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্রের হঠাৎ বিলুপ্তি

সুলাইমান (আঃ)-এর মৃত্যুর পরেই পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্র ভেঙে পড়তে শুরু করে এবং অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইসরায়েলি ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও আঘাতমূলক ঘটনা ছিল। পবিত্র ইসরায়েলের এই রহস্যময় বিলুপ্তির কারণ সম্পর্কে তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ছিল না তখনও নয়, আজও নয়! বরং, তারা এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছে এবং তাদের ব্যাখ্যায় ভিন্নতা দেখা দিয়েছে।
একমাত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পরেই মহান আল্লাহ প্রথমবারের মতো পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিলুপ্তির সঠিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন। আমরা এই বিষয়ে একটি বই লিখেছি যার শিরোনাম: *'কুরআন, দাজ্জাল এবং জাসাদ'*। পাঠকগণ সেই বইয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা খুঁজে পাবেন।

কুরআন ঘোষণা করে যে, ইসরায়েলিদের মধ্যে যে সব বিষয় নিয়ে মতবিরোধ ছিল, তার অনেক কিছুর ব্যাখ্যা দিতেই এটি এসেছে। পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ছিল তেমনই একটি বিষয়। এখানে কুরআনের সেই ব্যাখ্যাটি সংক্ষেপে দেওয়া হলো।

ইতিহাসের ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন পবিত্র ইসরায়েল বিশ্বে একটি পবিত্র রাষ্ট্র, অর্থাৎ 'ঈশ্বরের শান্তিস্থাপক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখনই মহান আল্লাহ সুলাইমান (আঃ)-কে এমন একটি ঘটনার সম্মুখীন করেছিলেন যা তাকে ভীষণ দুর্দশাগ্রস্ত করেছিল।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

আর আমি তো সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তার সিংহাসনের উপর রেখেছিলাম একটি দেহ, অতঃপর সে আমার অভিমুখী হল।

কোরআন সূরা সাদ, আয়াত ৩৪

সুলাইমান (আঃ) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে তিনি তার সিংহাসনে কাউকে বসে থাকতে দেখেছিলেন। কুরআন সেই ব্যক্তিকে 'জাসাদ' হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং এই স্বপ্নকে সুলাইমানের জন্য একটি 'ফিতনা' বা দুঃখের কারণ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

সুলাইমান (আঃ) সেই জাসাদকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। তিনি সেই স্বপ্নের মানে এবং এর গভীর তাৎপর্যও বুঝেছিলেন।

কী ছিল সেই জাসাদটি ?

কুরআন অধ্যয়নের জন্য শুধুমাত্র একটি অভিধান ব্যবহার করে 'জাসাদ' শব্দের অর্থ খোঁজা, অথবা এই আয়াতটিকে বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ,এককভাবে অধ্যয়ন ও বোঝা, কোনোভাবেই সঠিক পদ্ধতি নয়।
কুরআন অধ্যয়নের সঠিক পদ্ধতি হলো এটিকে বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন না করে পুরো কুরআন একসাথে অধ্যয়ন করা । অর্থাৎ, কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন দিয়েই খুঁজতে হবে। সুলাইমানের সেই স্বপ্নের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া থেকেই আমরা জাসাদ কে বা কী ছিল সে সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি।

সুলাইমান (আঃ) সেই স্বপ্নের জবাবে মহান আল্লাহর কাছে দুআ (প্রার্থনা) করেছিলেন, এবং একই সাথে নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করেছিলেন যে, তার পরে যেন আর কেউ তার ইসরায়েল রাজ্যের উত্তরাধিকারী না হয়। তার এই প্রার্থনার মধ্যে আরও ছিল যে, ইতিহাসে যেন এমন কোনো রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য না আসে যা তার পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্রের অনুরূপ হতে পারে।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَ هَبْ لِیْ مُلْكًا لَّا یَنْۢبَغِیْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِیْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

সুলাইমান (আঃ) প্রার্থনা করলেন: "হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহ ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভনীয় না হয় (অর্থাৎ, আমার মতো রাজত্ব যেন আর কেউ না পায়)। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশক্তিমান, সর্বমহান।"

মহান আল্লাহ সুলাইমানের প্রার্থনা কবুল করলেন। ফলে পবিত্র ইসরায়েল এমন এক অনন্য রাষ্ট্র হয়ে উঠলো, যার সাথে আর কিছুর তুলনা হয় না। আর সুলাইমানের মৃত্যুর পরপরই আল্লাহ সেই রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করে দিলেন। এমনটা ঘটার দুটি কারণ ছিল: সুলাইমানের প্রার্থনা এবং ইসরায়েলিদের পবিত্র ভূমির অধিকারের শর্ত ভেঙে ফেলা।

এমনকি যখন মসীহ ফিরে আসবেন এবং জেরুজালেমে পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্র পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবেন, তখনও তা সুলাইমানের পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্রের সাথে তুলনীয় হবে না।

সুলাইমান (আঃ)-এর সেই স্বপ্নের প্রতি তার প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে আমরা জাসাদ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজেই অনুমান করতে পারি:

- জাসাদ একজন ব্যক্তি ছিলেন, শুধুমাত্র মৃতদেহ বা নিছক দেহ নয়।
- জাসাদ ছিলেন অত্যন্ত দুষ্ট ও শয়তানপ্রবৃত্তি সম্পন্ন।
- জাসাদের লক্ষ্য ছিল সুলাইমানের রাজত্ব অর্জন করা, অর্থাৎ পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারী হওয়া; এবং যেহেতু পবিত্র ইসরায়েল তখন বিশ্বের শাসক রাষ্ট্র ছিল, তাই জাসাদ চেয়েছিলেন সেই রাজ্যের মাধ্যমে পুরো বিশ্ব শাসন করতে।

জাসাদই আসলে দাজ্জাল, ভন্ড মসীহ

এই লেখক জাসাদকে চিনতে পেরেছেন, যাকে সুলাইমানের সিংহাসনে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল। সে হলো দাজ্জাল, মিথ্যা মসীহ, যে শেষ পর্যন্ত মানব রূপে, একজন জীবিত, হাঁটাচলা করা, কথা বলা মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে।

কেউ যেন এই লেখকের উপরের মতামতটি (জাসাদকে দাজ্জাল, মিথ্যা মসীহ হিসেবে চিহ্নিত করা) ততক্ষণ পর্যন্ত মেনে না নেয়, যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হয় যে এই লেখক সঠিক!
আমাদের মতে, দাজ্জালকে কুরআনে 'জাসাদ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ তার মধ্যে সেই 'রূহ' বা আত্মা নেই, যা মহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষের মধ্যে ফুঁকে দেন।

দাজ্জাল, মিথ্যা মসীহ-এর মানুষের মতো বাহ্যিক সব বৈশিষ্ট্য থাকবে, কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক সত্তা থাকবে না। যারা তাকে অনুসরণ করবে, তারাও শেষ পর্যন্ত একটি আধ্যাত্মিক শূন্যতায় বাস করবে। তারা মানসিকভাবে বধির, মূক এবং অন্ধ হয়ে যাবে এবং সে তাদের জাহান্নামের আগুনে নিয়ে যাবে।

যারা দাজ্জালকে অনুসরণ করে, তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তারা দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনযাপনকে সহজেই গ্রহণ করে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং আধুনিক জীবনের

সবকিছু দ্রুত বুঝে ফেলার অসাধারণ ক্ষমতা তাদের আছে। কিন্তু এর ফলস্বরূপ, গভীর চিন্তা করার বা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তাদের থাকে না, যার জন্য সময় ও ধৈর্য দরকার। তাই তারা কুরআনের সেই জ্ঞান কখনোই বুঝতে পারে না, যা কেবল গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।
(বিস্তারিত জানতে আমার বই 'দ্য কুরআন, দাজ্জাল অ্যান্ড দ্য জাসাদ' দেখুন।)

মসীহ আগমনের ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি

পবিত্র ইসরায়েলের রহস্যজনক বিলুপ্তি ও পতনের পর, ইসরায়েলীরা যখন তীব্র শোক ও কষ্টে ডুবে ছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য এক দারুণ সুখবর নিয়ে এলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি একজন নবী পাঠাবেন, যিনি 'মসিহ' নামে পরিচিত হবেন। এই মসিহ এসে ইসরায়েলের সেই গৌরবময় দিনগুলো ফিরিয়ে আনবেন, যখন তারা গোটা বিশ্বে রাজত্ব করত। এই সংবাদে ইসরায়েলীদের মনে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল।

এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তারা মসীহ সংক্রান্ত ঐশী প্রতিশ্রুতির সংবাদটি কেবল ইসরায়েল রাষ্ট্রের পতনের পরেই নয়, বরং (কুরআনের সূরা আল-ইসরা, ১৭:৪-৭ অনুসারে) তাদের প্রথম ‘ফাসাদ’ বা বিপর্যয়কাল অতিবাহিত হওয়ার পরেও লাভ করেছিল। সেই বিপর্যয়কালেই ইসরায়েল জাতিকে পবিত্র ভূমি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং বাবিলনে দাসত্বে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারা সম্ভবত প্রায় এক শতাব্দীকাল বাবিলনে নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিল এবং সেই সুদীর্ঘ সময় ধরে তারা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিল সেই বিশেষ দিনটির জন্য, যেদিন প্রতিশ্রুত মসীহের শুভাগমন ঘটবে।

যদিও প্রত্যেক খ্রিস্টান ও ইহুদিই মসীহের আগমনে বিশ্বাস স্থাপন করে, তথাপি এটি এক গভীর রহস্য যে, ইনজিলের পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতে—যেখানে বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত বহু নবীর জীবন ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ রয়েছে—সেখানে ঐশীভাবে প্রতিশ্রুত সেই মসীহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এমনটা হতে পারে যে কোনো ব্যক্তি হয়তো এই ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে মসিহের আগমন সংক্রান্ত তথ্যগুলো সরিয়ে দিয়েছে। কারণ, এই তথ্যগুলো থাকলে যীশু (আঃ)-ই যে সেই প্রতিশ্রুত মসিহ, তা আরও জোরালোভাবে প্রমাণিত হতো।

আল্লাহ যখন ইসরায়েলীদের পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসে উপাসনালয় তৈরি করার সুযোগ দিলেন, তখন তারা খুব আশা করেছিল যে মসিহ তাড়াতাড়ি আসবেন। আর ঠিক তাই হলো, মসিহ এলেন! কিন্তু আল্লাহ যখন সেই মসিহকে পাঠালেন, তখন ইসরায়েলীদের সবাই তাকে মানলো না। তাদের জ্ঞানী-গুণী বা নেতারা তাকে অস্বীকার করল। এমনকি সেই সময় থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত, অর্থাৎ ২০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা তাকে অস্বীকার করেই যাচ্ছে।

ইতিহাসের ঠিক এই সময়টাতেই অর্থাৎ ইসরায়েলীদের পবিত্র ভূমি থেকে প্রথমবার বিতাড়িত হওয়ার পর এবং প্রায় একশো বছর নির্বাসনে থাকার পর যখন তারা ফিরে এসে উপাসনালয় পুনর্নির্মাণ করেছিল তখন থেকেই এই বইয়ের মূল বিষয়বস্তু শুরু হচ্ছে। কারণ, ঠিক এই সময়েই আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করে তাদের কাছে মসিহকে পাঠিয়েছিলেন।

মসিহ কে ছিলেন? তিনি কীভাবে আবির্ভূত হলেন? আর কেন ইসরায়েলের তখনকার ধর্মগুরুরা (রাবাইরা) তাকে মানতে রাজি হলো না? এই সব জানতে আমরা বইয়ের পরের অধ্যায়ে কোরআনের সাহায্য নেব।

দ্রষ্টব্য:

ভারতের মির্জা গোলাম আহমদ নামের এক ব্যক্তি মরিয়মের পুত্র ফিরে আসার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে নিজেকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে, সেই অলৌকিক প্রত্যাবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী তারই মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তার একটি বড় সমস্যা ছিল: তিনি ছিলেন একজন পাঞ্জাবী নারীর সন্তান, অথচ ভবিষ্যদ্বাণীতে মরিয়মের পুত্র এর ফিরে আসার কথা বলা হয়েছিল। এমনকি যদি তার পাঞ্জাবী মায়ের নাম বদলে মরিয়ম রাখা হয়, তবুও তার সমস্যা সমাধান হবে না। কারণ, ইতিহাসের পাতায় কুমারী মরিয়ম কেবল একজনই।

অধ্যায়: ২

কুরআনে মসীহের বংশপরিচয় ও পরিচিতি

এই অধ্যায়ে লেখককে অনেক সময় কোরআনের একই আয়াত একাধিকবার উল্লেখ করতে হবে ; আমরা আশা করি আমাদের পাঠক এই প্রয়োজনীয়তাটুকু বুঝবেন।

কোরআনের সূরা ওয়াকিয়াহ (৫৬:৭৫)-তে আল্লাহ বলেছেন, তিনি তারাদের অবস্থানের শপথ করছেন। তিনি এটা বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই শপথটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা কোরআন বোঝার একটা বিশেষ পদ্ধতি। যেমন আমরা তারা দেখে পথ ঠিক করি, ঠিক সেভাবেই কোরআনের গভীর জ্ঞান পেতে হলে আমাদের জানতে হবে এর আয়াতগুলো কীভাবে একটার সাথে আরেকটা সুন্দরভাবে যুক্ত।

মসীহ-সংক্রান্ত আমাদের এই আলোচনার মূল ভিত্তি কেবল কুরআনে মসীহ সম্পর্কিত আয়াতগুলো খুঁজে বের করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং, এর মূল উদ্দেশ্য হলো এটা প্রদর্শন করা যে, আয়াতগুলো কীভাবে একে অপরের সাথে এক সুনিপুণ সামঞ্জস্যে আবদ্ধ এবং সেগুলোর মধ্যেকার অন্তর্নিহিত সম্পর্কটি উন্মোচন করা।

এই গ্রন্থটি মসীহ-সংক্রান্ত কুরআনের সকল আয়াতকে একত্রিত করে একটি সুসংহত রূপ দেওয়ার প্রয়াস চালিয়েছে। অতঃপর, এর এমন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পাঠককে এই বিষয়ের এক সামগ্রিক ও অর্থপূর্ণ চিত্র উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে।
যখন আমরা মসীহ-সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলোকে একত্রিত করি, তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, সেগুলো পৃথিবীতে মসীহের আগমনের জন্য আল্লাহর এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই সাক্ষ্য বহন করে।

এই আয়াতগুলো মসীহের বংশপরিচয়কে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এর পাশাপাশি, যারা মসীহকে প্রত্যাখ্যান করছে, তাদের জন্য কী ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে, সেই বিষয়েও এই আয়াতগুলো এক কঠোর সতর্কবার্তা উচ্চারণ করে।

ইহুদি, খ্রিস্টান ও মসীহ

মসীহের বংশপরিচয় নিয়ে কুরআনের আলোচনায় যাওয়ার আগে, আমরা এমন একটি ঘোষণার দিকে নজর দেব, যা খ্রিস্টান ও ইহুদি—উভয় পক্ষের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে তাদের মধ্যেকার মতভেদগুলোর ক্ষেত্রে। কুরআন ঘোষণা করে যে, এটি এমন একটি ব্যাখ্যা দেয়, যা সেই মতভেদগুলোর সমাধান করে। এবং এর মধ্যে মসীহ-সংক্রান্ত তাদের পারস্পরিক মতপার্থক্যগুলোও নিশ্চিতভাবেই অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

এই কোরআন বণী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে।

কোরান সূরা নামল আয়াত ৭৬

খ্রিস্টান ও ইহুদিদের জন্য এটা খুবই জরুরি যে, তারা যেন কুরআনকে শুধু ইব্রাহিমের(আঃ) আল্লাহর কালাম হিসেবেই না দেখে, বরং তাদের নিজেদের মধ্যে যে বিষয়গুলো নিয়ে মতের অমিল রয়েছে, সে সম্পর্কে কুরআন কী বলে, তাও যেন মনোযোগ দিয়ে পড়ে।

এই বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ মসীহ, হলো সেই সবচেয়ে বড় কারণ, যা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বিভক্ত করে রেখেছে।

অতএব, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শুধু কুরআনকে ইব্রাহীমের (আঃ) আল্লাহর বাণী হিসেবে পর্যালোচনা করা নয়, বরং সেই বিষয়গুলোও অধ্যয়ন করা জরুরি যেখানে তারা মতপার্থক্য প্রকাশ করে। এই বইয়ের মূল বিষয় অর্থাৎ আল-মসীহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভাজন সৃষ্টি করেছে।

খ্রিস্টানরা কুমারী মরিয়মের (আঃ)পুত্র যীশুকে আল-মসিহ হিসেবে বিশ্বাস করে। তবে তারা আরও ঘোষণা করে যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র এবং ত্রিত্ববাদী ঈশ্বরের তিন ব্যক্তির

মধ্যে একজন অর্থাৎ,একজন ঈশ্বর যিনি পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর এই তিন ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়ে গঠিত। খ্রিস্টানরা তার মা মরিয়ম (আঃ)-কেও বিশ্বের নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

এই বইটি খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদী ঈশ্বর, অর্থাৎ তিন ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়ে গঠিত ঈশ্বর, এবং মসিহকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে তাদের বিশ্বাস নিয়ে কোনো যুক্তি বা বিতর্ক করার চেষ্টা করে না। বরং আমরা শুধু এই বিষয়ে ঐশ্বরিক ঘোষণাগুলো সহজভাবে তুলে ধরছি।

ইহুদিরা খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদী ঈশ্বরকে (যিনি একই সাথে এক ঈশ্বর) বিশ্বাস করে না এবং জোর দিয়ে বলে যে, ঈশ্বর একক সত্তা। তবে তারা যীশুকে (আঃ) মসিহ হিসেবেও অস্বীকার করে। কারণ, তারা বিশ্বাস করে যে তিনি পাপের মাধ্যমে গর্ভে এসেছিলেন, তাই তার এবং তার মা মরিয়মের প্রতি তাদের সবচেয়ে নিম্ন ধারণা রয়েছে। তাদের সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ যা দিয়ে তারা নিশ্চিত করে যে যীশু মসিহ হতে পারেন না, তা হলো তার ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু, যা তারা নিজেদের চোখে দেখেছিল। তারা নিশ্চিত যে তিনি মসিহ হতে পারেন না, কারণ তিনি পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্রকে পুনরুদ্ধার না করে এবং জেরুজালেম ও সেই পবিত্র রাষ্ট্র থেকে মানবজাতির উপর তার চিরস্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা না করেই মারা গেছেন।

কোরআন যীশু (আঃ)-কে মসিহ হিসেবে খ্রিস্টানদের বিশ্বাসকে সমর্থন করে, তবে জোর দিয়ে বলে যে, আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। এটি স্পষ্টভাবে এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে যে মসিহ 'ঈশ্বরের পুত্র' এবং তিনি তিন ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়ে গঠিত ঈশ্বরের তিনজনের একজন, (অর্থাৎ ত্রিত্ববাদী ঈশ্বর।)

يٰٓاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لَا تَغۡلُوۡا فِىۡ دِيۡنِكُمۡ وَ لَا تَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الۡحَقَّ ؕ اِنَّمَا الۡمَسِيۡحُ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ۚ اَلۡقٰٮهَاۤ اِلٰى مَرۡيَمَ وَ رُوۡحٌ مِّنۡهُ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۟ وَ لَا تَقُوۡلُوۡا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنۡتَهُوۡا خَيۡرًا لَّكُمۡ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ
اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبۡحٰنَهٗۤ اَنۡ يَّكُوۡنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيۡلًا

ওহে কিতাবধারীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, আর আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলো না, ঈসা মাসীহ তো আল্লাহর রসূল আর তাঁর বানী যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, আর তাঁর পক্ষ হতে নির্দেশ, কাজেই তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আনো, আর বলো না 'তিন' (জন ইলাহ আছে), নিবৃত্ত হও, তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আল্লাহ তো একক ইলাহ, তিনি পবিত্র এথেকে যে, তাঁর সন্তান হবে। আসমানসমূহে আর যমীনে যা আছে সব কিছু তাঁরই, আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

সূরা আন নিসা, আয়াত **১৭১**

কুরআন আরও নিশ্চিত করে যে, যীশু (আঃ) কুমারী মরিয়মের (আ:) মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও, ঘোষণা করে যে তার মা, কুমারী মরিয়ম (আ:), বিশ্বের সকল নারীর মধ্যে সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। খ্রিস্টান ও মুসলিম উভয়ই বিশ্বাস করে যে মসিহ এসেছিলেন, এবং চলে গেছেন এবং একদিন ফিরে আসবেন। অন্যদিকে, ইহুদিরা যীশুকে (আঃ) মসিহ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করায়, এখনও হতাশভাবে এই বিশ্বাস ধরে আছে যে মসিহ এখনো আসেননি, ভবিষ্যতে আসবেন।
কোরআনে এই বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে মসিহ এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার ২০০০ বছরেরও বেশি সময় পর (অলৌকিকভাবে) ফিরে আসবেন। পরের অধ্যায়ে সেই প্রমাণগুলো তুলে ধরা হবে।

খ্রিস্টান ও মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে মসিহ ফিরে আসার আগে দাজ্জাল নামে এক প্রতারক লোক আসবে। সে নিজেকে মসিহ বলে চালাবে এবং জেরুজালেম থেকে পৃথিবী শাসন করবে। সে বলবে যে এটা সোলায়মানের পবিত্র ইসরায়েল রাজ্য। মুসলিমরা তাকে দাজ্জাল বা মিথ্যা মসিহ বলে। খ্রিস্টানরা তাকে অ্যান্টিখ্রিস্ট বলে। প্রমাণ আছে যে ইহুদিরাও দাজ্জাল সম্পর্কে জানে, কিন্তু তারা তা প্রকাশ করে না। তারা নবী মুহাম্মদ (ﷺ) কে তিনটি প্রশ্ন করেছিল, যার উত্তর দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি ইব্রাহিমের (আ:) আল্লাহর সত্যিকারের নবী। দাজ্জাল ছিল সেই প্রশ্নগুলোর একটি। (আমাদের বই 'সূরা কাহফ এবং আধুনিক যুগ' দেখতে পারেন।) এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে বলা হবে যে, মসিহ যখন ফিরে আসবেন, তখন তিনি এই অ্যান্টিখ্রিস্টকে মেরে ফেলবেন।

মসীহ সম্পর্কে খ্রিস্টান, ইহুদি আর মুসলিমদের বিশ্বাসের মূল অমিলগুলো বলার পর, এখন আমরা কুরআনের সেই ঐশী তথ্যগুলো তুলে ধরব, যা তাদের সকল মতপার্থক্যকে একেবারে পরিষ্কার করে দেয়। আর আমরা এই কাজটি করছি কারণ, কুরআন নিজেই বলেছে যে,এটাই তার অন্যতম প্রধান কাজ। কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে যে, বনী ইসরাঈলেরা যে বিষয়গুলো নিয়ে মতভেদ করে, তার সমাধান সে দেবে (দেখুন: কুরআন, সূরা আন-নামল, ২৭:৭৬)।

মসিহের বংশপরিচয় ও ইমরানের পরিবার

মসিহ (আঃ)-এর আগমন সম্পর্কে কুরআনের আলোচনা শুরু হয়েছে এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, যার নাম ছিল ইমরান। তিনি হলেন সেই আমরান (Amran), যার উল্লেখ (অর্থাৎ, তাওরাতের যাত্রাপুস্তকে বর্ণিত আমরান) পাওয়া যায়। তাঁর মর্যাদা এতই বড় যে, কুরআনের তৃতীয় সূরার নামই তাঁর পরিবারকে কেন্দ্র করে রাখা হয়েছে সূরা আলে ইমরান অর্থাৎ ইমরানের পরিবার।

লেখকের মতে, তাওরাতে বর্তমানে তাঁর নাম Amram লেখা হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা Amran হওয়াই সঠিক, কারণ এই নামটির উচ্চারণ আরবি ‘Imrān-এর সঙ্গে পুরোপুরি মেলে, অথচ Amram-এর সঙ্গে মেলে না। তাই লেখক এই বইয়ে তাঁকে ইমরান নামেই উল্লেখ করেছেন।

ইমরান, মিশরে বাস করতেন এবং তিনি বনী ইসরাঈল বা ইসরায়েলীয়দের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা পবিত্র ভূমি ছেড়ে মিশরে বসবাস করতে এসেছিলেন। তারা মিশরে চলে এসেছিলেন কারণ নবী ইউসুফ (আঃ), তাদের তেমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমাদের ধারণা যে আল্লাহ তায়ালা তাদের মিশরে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছিলেন এমন কিছু কারণে যা এই অধ্যায়ে প্রকাশ করা হবে। ইমরান ছিলেন আল্লাহর দুই নবীর পিতা, নবী মূসা,(আঃ) এবং নবী হারুন (আঃ)

মুহাম্মদ আসাদ ইমরান সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন:

ইমরান (আঃ)-এর পবিত্র বংশধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন মূসা (আঃ) এবং হারুন (আঃ)। তাঁদের পিতা ছিলেন ইমরান (আঃ), যিনি বাইবেলে ‘আমরান’ নামে পরিচিত।

এই বংশেরই অংশ ছিলেন হারুন (আঃ)-এর উত্তরসূরিগণ, অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের যাজক শ্রেণি।
ইয়াহইয়া (আঃ) বা জন দ্য ব্যাপ্টিস্টও এই একই পরিবারের অংশ ছিলেন, কারণ তাঁর বাবা-মা উভয়েই ছিলেন হারুনের বংশধর। (যেমন, লূকের ইঞ্জিল ১:৫ অনুযায়ী তাঁর মা এলিজাবেথ ছিলেন 'হারুনের কন্যাদের একজন')।
একইভাবে, ঈসা (আঃ)-ও এই বংশের সাথে সম্পর্কিত, কারণ তাঁর মা মরিয়ম (আঃ)-কে কুরআনে (১৯:২৮) 'হারুনের বোন' বলা হয়েছে। মরিয়ম (আঃ) ছিলেন ইয়াহইয়ার নিকটাত্মীয়া। এখানে 'হারুনের বোন' বলার কারণ হলো, প্রাচীন সেমিটিক জাতিদের মধ্যে তাদের কোনো মহান পূর্বপুরুষের নামে কাউকে ডাকাটা ছিল একটা প্রথা।
আসলে, ইমরান (আঃ)-এর পরিবারের এই বর্ণনাটি হলো যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, মরিয়ম এবং ঈসা (আঃ)-এর জীবনের বরকতময় ঘটনাগুলো শুরু করার একটি ভূমিকা।

(মুহাম্মদ আসাদ, সূরা আলে ইমরান ৩:৩৩-৩৪ এর অনুবাদ ও ভাষ্য)

এই সম্মানিত ইসলামী পণ্ডিত কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি অদ্ভুত ও রহস্যময় কাজ করেছেন। তিনি ইমরান (আঃ)-এর পরিবারের আলোচনায় মূসা (আঃ)-কে রেখেছেন, কারণ মূসা (আঃ) ছিলেন ইমরানের ছেলে। কিন্তু তিনি মূসা (আঃ)-এর বংশের বাকিদের এই পরিবার থেকে বাদ দিয়েছেন, যদিও তারাও ইমরানেরই বংশধর। কেন তিনি এমনটা করলেন, তা বোঝা সত্যিই কঠিন।

অথচ, ইমরান (আঃ)-এর বংশেই একজন নারীর কথা কুরআনে বলা হয়েছে, যাঁকে 'ইমরানের পরিবারের একজন নারী' বলা হয়। তিনি ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর নানী। তাঁর এক মেয়ে ছিলেন ঈসা (আঃ)-এর মা, মরিয়ম (আঃ), যাঁকে কুরআনে 'ইমরানের কন্যা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার রব, আমার গর্ভে যা আছে, নিশ্চয় আমি তা খালেসভাবে আপনার জন্য মানত করলাম। অতএব, আপনি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ'।

সূরা আল-ইমরান আয়াত ৩৫

وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ

এবং ইমরান (আঃ)-এর বংশের এক কন্যা মারিয়াম (আঃ), যিনি তাঁর সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন। অতঃপর আমরা তাঁর (গর্ভে) আমাদের রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। তিনি তাঁর রব-আল্লাহর বাণীসমূহ এবং তাঁর ওহীসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন একান্ত অনুগতদের একজন।

সূরা তাহরীম আয়াত ১২

মসিহ ইমরানের পরিবার থেকেই আসবেন, এই কারণেই কুরআন (সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৩-৩৪) তাঁকে এমন এক অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তাঁকে আদম, নূহ এবং ইব্রাহিম (আঃ) এর পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁদের আল্লাহ তায়ালা নিজেই মনোনীত করেছেন। আর তাঁর বংশধরদের এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে মানবজাতির সকলের উপরে সম্মানিত করা হয়েছে:

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ ও ইবরাহীমের পরিবারকে এবং ইমরানের পরিবারকে সৃষ্টিজগতের উপর মনোনীত করেছেন।

সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৩

ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ۗ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"তারা একে অপরের বংশধর, আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৪

এটা পাঠকদের জন্য গভীরভাবে ভেবে দেখার মতো একটি বিষয়। কুরআনে প্রথম দুজন নবী, আদম ও নূহ (আঃ)-কে কেবল তাঁদের নামেই উল্লেখ করে সম্মানিত করা হয়েছে; তাঁদের পরিবারকে বিশেষভাবে 'মনোনীত' করার কথা বলা হয়নি। কিন্তু এরপর ইব্রাহিম (আঃ)-এর ক্ষেত্রে এসে আমরা দেখি, তাঁর পরিবারকে বিশেষভাবে সম্মানিত ও নির্বাচিত করা হয়েছে। আর তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ইমরান (আঃ)-

এর পরিবারকেও একইভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে—এমন একটি পরিবার, যাদের উপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আল্লাহর রহমত অবিরাম বর্ষিত হয়েছে।
এই বিষয়টি এখন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে:

- কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইমরানকে (যিনি আল্লাহর কোনো নবী ছিলেন না) তাঁর সেই সম্মানীয় তালিকায় স্থান দিলেন, যেখানে আদম, নূহ এবং ইব্রাহিমের মতো উচ্চ মর্যাদার নবীদের নাম শোভা পাচ্ছে?

- কেন এই ঘোষণা করা হলো যে ইব্রাহিমের পরিবার এবং ইমরানের পরিবারকে আল্লাহ তায়ালা প্রজন্ম পরম্পরায় সম্মানিত করার জন্য বেছে নিয়েছেন?

- এই নিরবচ্ছিন্ন সম্মাননার ধারায় যা একের পর এক প্রজন্ম ধরে বয়ে চলেছে এর গভীরে কোন ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা লুকায়িত আছে?

- কুরআনে ইমরানকে এতটা সম্মান কেন দেওয়া হয়েছে যে, সূরা আল-ফাতিহা এবং সূরা আল-বাক্বারার ঠিক পরপরই, অর্থাৎ কুরআনের একেবারে শুরুতেই সূরা আলে ইমরান (ইমরানের পরিবার) স্থান লাভ করেছে?

কুরআনের এই আয়াতগুলোর পারস্পরিক সংযোগ থেকে আমাদের উপলব্ধি এই যে, ইমরানের মাধ্যমে ঐশ্বরিক নির্দেশনার এক নতুন বংশধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা আমাদেরকে মিশরের বনী ইসরাইল থেকে সরাসরি মসীহ ঈসা (আঃ) পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আদম, নূহ, ইব্রাহিম এবং ইমরান (আঃ) হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঠিক করে দেওয়া চারটি আলোকবর্তিকা, যা আমাদের পথ দেখায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, যখন আমরা মিশরের বনী ইসরাইল থেকে মসীহের দিকে এগিয়ে যাই, তখন এই পবিত্র আলোকবর্তিকা গুলোই আমাদের পথ চলার দিশা দেয়।

অতঃপর কুরআন মসীহ (আঃ)-এর পথের আলোকবর্তিকাগুলো উন্মোচন করতে শুরু করে, এবং প্রথমেই এটি নিশ্চিত করে যে, ইমরান (আঃ) ছিলেন মূসা (আঃ) এবং তাঁর ভাই হারুন (আঃ)—উভয়েরই পিতা।

এই সত্যটি নিম্নোক্ত আয়াতে বনী ইসরাইলের সেই উক্তির মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়, যেখানে তারা মরিয়ম (আঃ)-কে 'হারুনের বোন' বলে সম্বোধন করেছিল:

يٰۤاُخۡتَ هٰرُوۡنَ مَا كَانَ اَبُوۡكِ امۡرَ اَ سَوۡءٍ وَّ مَا كَانَتۡ اُمُّكِ بَغِيًّا

'হে হারূনের বোন! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না। আর তোমার মা-ও ছিল না ব্যভিচারিণী'।

সূরা মরিয়ম আয়াত ২২

মরিয়ম (আঃ) তাঁর মায়ের দিক থেকে ইমরানের পরিবারেরই কন্যা। যেহেতু তাঁর মা 'ইমরানের স্ত্রী' হিসেবে ইমরানের পরিবারেরই অংশ, এখন, যেহেতু ইসরাঈলীরা নিজেরাই মরিয়মকে 'হারুনের বোন' বলে ডেকেছে, সেহেতু এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হারুন এবং তাঁর ভাই মূসা (আঃ)—দুজনেই ইমরানের পরিবারেরই সদস্য।

একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো,কুরআন আমাদেরকে মসীহ পর্যন্ত পৌঁছানোর সঠিক পথটি দেখিয়ে দিয়েছে। কুরআন বিশেষভাবে জানিয়েছে যে, মসীহ ইমরানের বংশে এসেছেন মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে, হারুন (আঃ)-এর মাধ্যমে নয়।

যে সমালোচক বিরোধিতা করেন, তার এক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়ে উপরের আয়াতে (১৯:২৮) 'বোন' শব্দটি ব্যবহারের সাহিত্যিক তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

মারইয়াম (আঃ) -কে হারুনের বোন বলার দুটি কারণ রয়েছে:

- **প্রথম,** কারণ কুরআন এখানে 'বোন' শব্দটি একটি অলংকারিক অর্থে ব্যবহার করেছে, এর মানে এই নয় যে তিনি হারুনের সঙ্গে একই বাবা-মায়ের সন্তান।

- **দ্বিতীয়,** কুরআন চেয়েছিল যে মসীহ (যিনি মারইয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন) থেকে হারুন ও মূসা এবং সেখান থেকে ইমরান পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক বংশগত সম্পর্ক স্থাপন করা।

যেহেতু পূর্বে মারইয়ামের মাতাকে 'ইমরানের পরিবারের একজন নারী' (অর্থাৎ ইমরানের স্ত্রী নয়, বরং তাঁর পরিবারভুক্ত) হিসেবে এবং স্বয়ং মারইয়ামকে 'ইমরানের

কন্যা' (অর্থাৎ তাঁর সরাসরি জৈবিক কন্যা নয়, বরং তাঁর বংশধর) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং, একই যুক্তিতে, এখানে 'বোন' শব্দটি ব্যবহার করা সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ও যথাযথ।
কাজেই, যেসকল সমালোচক এর বিরোধিতা করেন, তাদের উচিত যুক্তিহীন সমালোচনা বন্ধ করে এটা স্বীকার করা যে, কুরআন যখন মারইয়ামকে ‘হারুনের বোন’ বলেছে, তখন তাঁরা এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এখানে 'বোন' শব্দটি রক্তের সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং এটি একটি বংশীয় ও আধ্যাত্মিক পরিচয়সূচক আলঙ্কারিক প্রয়োগ, যা ঠিক সেই ধারাতেই ব্যবহৃত হয়েছে, যেভাবে পূর্বে 'ইমরানের নারী' এবং 'ইমরানের কন্যা' শব্দগুলোর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।

কুরআনুল কারীমে একদিকে যেমন ইমরান এবং তাঁর পুত্র মূসা ও হারুনের উল্লেখ রয়েছে, তেমনই অন্যদিকে মারইয়ামের মাতা, স্বয়ং মারইয়াম এবং তাঁর পুত্র মসীহের যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে এই ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক ধারাবাহিকতা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে:

মহান আল্লাহ ইমরানকে এক নতুন 'আলে ইমরান' বা 'ইমরানের পরিবার' সূচনা করার জন্য মনোনীত করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মসীহের বংশধারা প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এর লক্ষ্য ছিল আরও সুদূরপ্রসারী—নবী ইব্রাহিম (আঃ) থেকে শুরু করে স্বয়ং মসীহ পর্যন্ত এক অখণ্ড আধ্যাত্মিক সেতুবন্ধন রচনা করা। (তাঁদের সবার উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)

আমরা আমাদের এই প্রাথমিক বিশ্লেষণের উপসংহারে ঘোষণা করছি যে কুরআন মসীহ (আঃ) এবং ইমরানের পরিবার-এর সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি মৌলিক বিষয় প্রতিষ্ঠা করেছে:

- প্রথমত, এটি দেখিয়েছে যে মারইয়ামের গর্ভে জন্ম নেওয়া শিশুটি ইমরানের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবে তার বংশ মূসা (আঃ) থেকে এসেছে, তাঁর ভাই হারুন (আঃ) থেকে নয়।

- দ্বিতীয়ত, এটি নিশ্চিত করেছে যে ইসরাইলী জনগণ, অর্থাৎ বনী ইসরাইল জানতো যে শিশুটি মূসার বংশধর হওয়ার মর্যাদা রাখে, কারণ তারা নিজেরাই মারইয়ামকে হারুনের বোন বলে উল্লেখ করেছিল।

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইসরাঈল জাতি জানে যে মূসা (আঃ) -কে আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর শাসক ও নেতা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, আর তাঁর বড় ভাই হারুন (আঃ)-কে মনোনীত করেছিলেন পুরোহিত বা ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য।
মসীহ এর বংশধারা হারুন(আঃ)-এর পরিবর্তে মূসা (আঃ)-এর দিকে সংযুক্ত করা হয়েছে, কারণ তাঁর দায়িত্ব ছিল শাসন করা পুরোহিত হওয়া নয়।

তবে মসীহ (আঃ) সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ কেবল মিসরে বনী ইসরাঈলের দাসত্ব থেকে শুরু করে তাঁর পবিত্র জন্ম পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক পথরেখাই অঙ্কন করে না; বরং একই সঙ্গে সেসব বনী ইসরাঈলের জন্যও কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে, যারা পরবর্তীকালে মসীহ (আঃ)-কে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করবে।

যখন ইউসুফ (আঃ) বনী ইসরাইলকে পবিত্র ভূমি ছেড়ে মিশরে চলে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্দেশেই কাজ করছিলেন।
এখানে একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়: নবী ইউসুফের নির্দেশিত বনী ইসরাঈলের পবিত্র ভূমি থেকে মিসরে যাত্রা শুরু, অর্থাৎ নতুন সূচনা, এবং তার ভাইদের সেই শত্রুভাবাপন্ন পরিকল্পনা, যেখানে তাঁকে একটি বালতিতে রেখে কূপে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল, একই ধারার দুটি বিপরীত চিত্র হিসেবে দেখা যেতে পারে।

ইউসুফ (আঃ) ও কূপের ঘটনার সময়, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ওহী পাঠিয়েছিলেন, যে একদিন তিনি নিজেই তার ভাইদেরকে জানাবেন তারা তাঁর সঙ্গে কী করেছিল:

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَ اَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের গভীরে ফেলে দিতে একমত হল (তখন তারা তাই করল) এবং আমি তার নিকট ওহী প্রেরণ করলাম এই মর্মে যে,'অবশ্যই তুমি তাদেরকে (ভবিষ্যতে) তাদের এই কর্ম সম্পর্কে জানাবে, এমতাবস্থায় যে, তারা উপলব্ধি করতে পারবে না'।

সূরা ইউসুফ, আয়াত ১৫

যখন বনী ইসরাঈল মিশরে গিয়েছিল—যা আমাদের মতে আল্লাহরই ইচ্ছায় ঘটেছিল—তখন তাঁর পরিকল্পনার দুটি দিক ছিল:

এর উদ্দেশ্য শুধু মসীহের আগমনের পথ তৈরি করাই ছিল না, বরং তাদের কাছে এমন একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া ছিল, যা শেষ যুগে গিয়েই পুরোপুরি স্পষ্ট হবে। এই বার্তার অংশ হিসেবেই, তারা ফেরাউনের অত্যাচার ভোগ করবে এবং নিজের চোখে দেখবে তার কী ভয়ংকর পরিণতি হয়। কিন্তু গল্পটা এখানেই শেষ নয়।

وَ اِذۡ فَرَقۡنَا بِكُمُ الۡبَحۡرَ فَاَنۡجَيۡنٰكُمۡ وَ اَغۡرَقۡنَاۤ اٰلَ فِرۡعَوۡنَ وَ اَنۡتُمۡ تَنۡظُرُوۡنَ

স্মরণ কর, যখন তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং ফেরাউন গোষ্ঠীকে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখছিলে।

সূরা আল-বাকারাহ ৫০

বনী ইসরাঈল ফেরাউনের মৃত্যুর আসল ঘটনা জানত না। তারা শুধু দেখেছিল ফেরাউন সাগরে ডুবে মারা গেছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি, ঘটনাটা সেখানেই শেষ নয়।

যেমন আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই জানতেন যে, একদিন নবী ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের সামনে দাঁড়িয়ে বলবেন, "তোমরা আমার সঙ্গে যা করেছিলে" তেমনি আল্লাহ জানতেন যে, বনী ইসরাঈলের এক অংশ একদিন মসীহ (আঃ)-কে অস্বীকার করবে এবং নিজেরাই ফেরাউনের মতো জুলুমকারী হয়ে উঠবে।

যখন ইতিহাসে সেই সময় আসবে যখন ইহুদিরা ফেরাউনের মতোই জুলুম করবে তখন ফেরাউনের পরিণতির ঘটনাটি আবারও ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হবে।

ফেরাউনের দেহ যেমন পানির ওপর ভেসে উঠেছিল, তেমনি তা আবার ইতিহাসে আবির্ভূত হবে এক কঠিন বার্তা নিয়ে:যারা ফেরাউনের মতো জীবন যাপন করবে অন্যায়, অহংকার ও জুলুমে ভরা জীবন তাদের পরিণতিও হবে ফেরাউনের মতোই করুণ মৃত্যু।

এটাই সেই মিল একদিকে নবী ইউসুফ (আঃ), তাঁর ভাইদের দ্বারা কূপে ফেলে দেওয়ার ঘটনা; আর অন্যদিকে ফেরাউনের দ্বারা মুমিনদের উপর চালানো নির্যাতন।

ফেরাউন কীভাবে মারা গিয়েছিল?

ফেরাউনের মৃত্যুর আসল ঘটনাটি কী ছিল, তা আল্লাহ কুরআনে প্রকাশ করার আগ পর্যন্ত পৃথিবীর কেউই জানত না। একারণেই, এই তথ্যটি কেবল কুরআন থেকেই পাওয়া সম্ভব।
তথাপি, এটি একদিকে যেমন সেই ইহুদিদের জন্য এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে, যারা মসীহ হিসেবে ঈসা (আঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তেমনই অন্যদিকে এটি সেই সমগ্র মানবজাতির জন্যও (গুরুত্বপূর্ণ), যারা কুরআনকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বাণী হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে ।

কুরআন সূরা ইউনুসে আমাদের জানিয়েছে যে, ফেরাউন যখন ডুবে যাচ্ছিল, তখন সে বুঝতে পেরেছিল যে সে আল্লাহ নয়, এবং তখন সে বনী ইসরাইলের আল্লাহর উপর বিশ্বাস ঘোষণা করেছিল। আল্লাহ তায়ালা একজন অত্যাচারীর মৃত্যুর মুহূর্তে এই বিশ্বাস ঘোষণার জবাবে ঘোষণা করলেন যে, তিনি ফেরাউনের দেহ সংরক্ষণ করবেন যাতে এটি তার পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের জন্য একটি নিদর্শন হিসেবে কাজ করতে পারে অর্থাৎ, সেইসব মানুষের জন্য যারা ফেরাউনের মতো

জীবনযাপন করবে এবং তারপর ফেরাউনের মতো মৃত্যু বরণ করবে। এখানে সূরা ইউনুসের ১০:৯০-৯২ আয়াতগুলো দেওয়া হলো:

وَ جٰوَزْنَا بِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُوْدُهٗ بَغْیًا وَّ عَدْوًا ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম আর ফির'আওন ও তার সৈন্য সামন্ত ঔদ্ধত্য ও সীমালঙ্ঘন ক'রে তাদের পেছনে ছুটল, অতঃপর যখন সে ডুবতে শুরু করল তখন সে বলল, 'আমি ঈমান আনছি যে, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই যাঁর প্রতি বানী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

সূরা ইউনুস, আয়াত ৯০

آٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ

[আল্লাহ্ বললেন:] "এখন? অথচ এর আগে তুমি তো ছিলে অবাধ্য এবং ছিলে ফাসাদ (অশান্তি ও ধ্বংস) সৃষ্টিকারীদের একজন!"
(এই ঐশ্বরিক উত্তর স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে, ফেরাউনের ঈমান ঘোষণা এসেছিল অনেক দেরিতে এমন এক মুহূর্তে, যখন আর তা গ্রহণযোগ্য ছিল না।)

সূরা ইউনুস, আয়াত **৯১**

আমাদের উপসংহার হলো নবী ইউসুফ (আঃ) নিজেই আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাঈল জাতিকে পবিত্র ভূমি থেকে মিশরে হিজরত বা স্থানান্তরিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এর পেছনে আল্লাহ তাআলার একটি গভীর উদ্দেশ্য ছিল: তিনি বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে চেয়েছিলেন এমন একটি অধ্যায়, যা মসীহ (আঃ)-এর আগমনের প্রস্তুতির জন্য নির্ধারিত ছিল।

আর সেই নতুন অধ্যায়ের সূচনা করার জন্য আল্লাহ তাআলা ইমরান (আঃ)-কে বেছে নেন, যিনি মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-এর পিতা ছিলেন। এ দুজন নবীর ভূমিকা ছিল সেই নতুন অধ্যায়ের কেন্দ্র বিন্দুতে বনী ইসরাঈল জাতিকে মুক্ত করা, তাওহীদের শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, এবং মসীহ আগমনের জন্য জাতিকে প্রস্তুত করা।

এখন কুরআনের ব্যাখ্যা দেওয়ার পালা বাকি থাকে কেন তারা ঈসা (আঃ)-কে সেই সময় মসীহ হিসেবে অস্বীকার করেছিল, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাদের মধ্যেই প্রেরণ করেছিলেন?
এবং কেন তারা আজও তাঁকে মসীহ হিসেবে মানতে অস্বীকার করে ?

মসীহ এক কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন

মসীহ অলৌকিকভাবে ও নিষ্পাপভাবে এক অবিবাহিত কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন। তিনি একটি অলৌকিক ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের ফলস্বরূপ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা একজন ফেরেশতার মাধ্যমে ঘটেছিল। সেই ফেরেশতা তাঁর মা মারইয়াম (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন, তাঁকে প্রভু-আল্লাহর পক্ষ থেকে এই খবর জানাতে যে তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবে; ফেরেশতাটি সেই পুত্র সন্তান এবং তাঁর মা উভয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছিলেন।

মারইয়াম (আঃ) মানবজাতির অন্য সব নারীর থেকে আলাদা ছিলেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মনোনীত করেছিলেন, তাঁকে পবিত্র করেছিলেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীর মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন:

وَ اِذۡ قَالَتِ الۡمَلٰٓئِکَۃُ یٰمَرۡیَمُ اِنَّ اللّٰہَ اصۡطَفٰکِ وَ طَہَّرَکِ وَ اصۡطَفٰکِ عَلٰی نِسَآءِ الۡعٰلَمِیۡنَ

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলেছিল, 'হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন, আর তামাম দুনিয়ার নারীদের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন'।

সূরা: ইমরান আয়াত ৪২

যদি মহান আল্লাহ নিজেই একজন নারীকে বেছে নিয়ে তাঁকে পৃথিবীর সমস্ত নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেন, তাহলে সেই নারীর জাতির বোঝা উচিত ছিল যে, তিনি কোনো সাধারণ নারী নন। বিশেষ করে এমন একটি জাতির, যারা সেই একই আল্লাহর ইবাদত করে এবং যাদের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে একের পর এক নবী এসেছেন। তাদের সূক্ষ্মতম প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এটা উপলব্ধি করা অপরিহার্য ছিল যে, তিনি কোনো সাধারণ নারী নন।

মারইয়ামের বিশেষ আধ্যাত্মিক মর্যাদা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কারণ তিনিই একমাত্র কন্যা ছিলেন, যিনি ছোটবেলা থেকেই বড় হওয়া পর্যন্ত উপাসনালয় অবস্থান করতেন। তাঁর মা পূর্বে শপথ করেছিলেন যে সন্তান জন্মালে তাঁকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উপাসনালয় উৎসর্গ করবেন, যাতে তিনি এক পূণ্যময় জীবন যাপন করতে পারেন। যখন সন্তান হিসেবে মেয়ে জন্মগ্রহণ করল (ছেলের বদলে), তখনও সেই শপথ পূরণ করা হলো এবং শিশুটিকে উপাসনালয় নিয়ে যাওয়া হলো। ইসরাইলী ইতিহাসে এটি একটি অনন্য ও অসাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইসরাইলী জনগণ, অর্থাৎ বনী ইসরাইল, মারইয়ামের অসাধারণ উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার আরও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পেয়েছিল যখন তিনি উপাসনালয় থাকাকালীন প্রধান রাব্বি জাকারিয়া (আঃ)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। নিশ্চিতভাবে তাদের নিজেদের প্রধান রাব্বির প্রমাণ নির্ভরযোগ্য হবে।

প্রধান রাব্বির তত্ত্বাবধানে উপাসনালয় থাকার সময় মারইয়ামের সাথে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, যা সম্ভবত ইসরাইলের সবাই জানত। মিহরাব ছিল মসজিদ বা উপাসনালয় একটি বিশেষ পবিত্র ঘর, যাকে 'সবচেয়ে পবিত্র স্থান' বলা হতো। এই ঘরে মূসা (আঃ) লোহিত সাগরে আঘাত করার জন্য যে লাঠি ব্যবহার করেছিলেন, তেমন পবিত্র জিনিস রাখা ছিল। প্রধান রাব্বি ছাড়া অন্য কারো সেই ঘরে ঢোকার অনুমতি ছিল না। কিন্তু যেহেতু মারইয়ামের দেখাশোনার দায়িত্ব তার ছিল, তাই মারইয়ামকে মিহরাবে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কুরআনের বর্ণনা থেকে মনে হয়, মারইয়াম সম্ভবত মিহরাবেই থাকতেন।

জাকারিয়া (আ.) যখনই মারইয়াম (আ.)-এর কামরায় প্রবেশ করতেন, তখনই তাঁর সামনে খাবার দেখতে পেতেন। অথচ এই খাবার তিনি নিজে নিয়ে আসেননি। তিনি যখন মারইয়ামকে এর উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন জানতে পারলেন যে— আল্লাহ তাআলা কুদরতিভাবে বেহেশত থেকে তাঁর জন্য এই খাবার পাঠাচ্ছেন।

ইসরাইলী জনগণ, অর্থাৎ বনী ইসরায়েল, নিশ্চয়ই নিজেদেরকে এই প্রশ্নটি করেছিল: কীভাবে মারইয়াম সেই "সবচেয়ে পবিত্র কক্ষ"-এ খাবার পেলেন, যখন জাকারিয়াহ (আঃ) নিজে তাকে তা দেননি, এবং তিনি জানতেনও না যে, এমন একটি ঘরে যেখানে তাঁর ছাড়া আর কেউ প্রবেশের অনুমতি পেত না সেই খাবার কীভাবে পৌঁছাল?

সব প্রমাণই একটি অলৌকিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছিল! তাই এটি সবার জানা ছিল যে মারইয়াম একজন সাধারণ ইসরাইলী মেয়ে ছিলেন না; বরং, তিনি এমন একজন মেয়ে ছিলেন যার প্রভু-আল্লাহর সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

এখানে কুরআনের প্রাসঙ্গিক অংশটি রয়েছে যা সূরা আলে ইমরানের ৩:৩৫-৪১ আয়াতে এই বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করে:

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার রব, আমার গর্ভে যা আছে, নিশ্চয় আমি তা খালেসভাবে আপনার জন্য মানত করলাম। অতএব, আপনি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ'।

সূরা আল-ইমরান আয়াত ৩৫

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰی وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَ لَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَ اِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

অতঃপর যখন সে তাকে প্রসব করল, বলে উঠল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি এবং আল্লাহ ভাল করেই জানেন যা সে প্রসব করেছে; বস্তুতঃ পুত্র কন্যার মত নয় এবং আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং আমি তাকে ও তার বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান হতে তোমার আশ্রয়ে ছেড়ে দিলাম।

সূরা আল-ইমরান আয়াত ৩৬

যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ উপরে উক্ত আয়াতে বলেন "আর পুরুষ নারীর সমান নয়" এটি ছিল মারইয়ামের মায়ের সেই বিস্ময়ভরা উক্তির প্রতি উত্তর, যখন তিনি দেখলেন যে তিনি একটি পুত্রের পরিবর্তে কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন।

আল্লাহ তাআলার এই মন্তব্যের গভীর তাৎপর্য হলো সেই কন্যাশিশুর (মারইয়াম) জন্য নির্ধারিত ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব কোনো পুরুষ সন্তান কখনোই পালন করতে পারত না।

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করছেন যে, এই কন্যা-শিশুই নির্বাচিত হয়েছেন এমন এক মহান দায়িত্বের জন্য যিনি পরবর্তীকালে মসীহ (আঃ)-এর জন্মদাত্রী হবেন।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّ اَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِیَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یٰمَرْیَمُ اَنّٰی لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ

অতঃপর তার রব তাকে উত্তমভাবে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমভাবে গড়ে তুললেন। আর তাকে যাকারিয়্যার দায়িত্বে দিলেন। যখনই যাকারিয়্যা তার কাছে তার কক্ষে প্রবেশ করত, তখনই তার নিকট খাদ্যসামগ্রী পেত। সে বলত, 'হে মারইয়াম, কোথা থেকে তোমার জন্য এটি'? সে বলত, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান বিনা হিসাবে রিযক দান করেন'।

সূরা আলে ইমরান (৩:৩৭)

এটা স্পষ্ট ছিল যে জাকারিয়া মারইয়ামের এই দাবি বিশ্বাস করেছিলেন যে খাবার অলৌকিকভাবে আল্লাহ তায়ালা থেকে এসেছে, কারণ তিনি সেই অলৌকিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সেই কক্ষেই একটি পুত্র সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যে তার উত্তরাধিকারী হবে:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِیۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِیۡعُ الدُّعَآءِ

ওখানেই যাকারিয়া নিজ প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার পক্ষ হতে একটি সুসন্তান দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী’।

সূরা আলে ইমরান (৩:৩৮)

فَنَادَتۡهُ الۡمَلٰٓئِكَةُ وَ هُوَ قَآئِمٌ یُّصَلِّیۡ فِی الۡمِحۡرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُكَ بِیَحۡیٰی مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ سَیِّدًا وَّ حَصُوۡرًا وَّ نَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ

অতঃপর ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল, সে যখন কক্ষে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা ও নারী সম্ভোগমুক্ত এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী’।

সূরা আলে ইমরান (৩:৩৯)

الَ رَبِّ اَنّٰی یَكُوۡنُ لِیۡ غُلٰمٌ وَّ قَدۡ بَلَغَنِیَ الۡكِبَرُ وَ امۡرَاَتِیۡ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ یَفۡعَلُ مَا یَشَآءُ

যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান হবে কীভাবে, আমি তো বার্ধক্যে পৌঁছেছি এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। তিনি বললেন, ‘এভাবেই, আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা-ই সম্পন্ন করে থাকেন’।

সূরা আলে ইমরান (৩:৪০)

قَالَ رَبِّ اجۡعَلۡ لِّیۡۤ اٰیَةً ؕ قَالَ اٰیَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَیَّامٍ اِلَّا رَمۡزًا ؕ وَ اذۡكُرۡ رَّبَّكَ كَثِیۡرًا وَّ سَبِّحۡ بِالۡعَشِیِّ وَ الۡاِبۡكَارِ

সে বলল, 'হে আমার রব, আমাকে দেন একটি নিদর্শন'। তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন হল, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ছাড়া কথা বলবে না। আর তোমার রবকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যা তার তাসবীহ পাঠ কর'।

সূরা আলে ইমরান (৩:৪১)

উপরের ঘটনাগুলো এমন স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করে যা মারইয়াম (আঃ)-এর অনন্য ও উচ্চ আত্মিক মর্যাদাকে প্রতিফলিত করে এমন মর্যাদা যা বনী ইসরাঈল জাতির জন্য একটি সতর্কবার্তা হওয়া উচিত ছিল, যেন তারা তাঁর সম্পর্কে কোনো বিষয়ে অবিবেচক আচরণ না করে।

তিনি এমন এক মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি মানত করেছিলেন যে তাঁর সন্তানকে মসজিদ এ উৎসর্গ করবেন, যেন সে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত এক ধর্মযাজক (পুরোহিত) হিসেবে বেড়ে ওঠে। যদিও সন্তানটি ছিল একটি কন্যা, তবুও তাকেই মসজিদ এ উৎসর্গ করা হলো।
মসজিদ এ প্রধান পুরোহিত (ইমাম) যাকারিয়া (আঃ) তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিলেন। তাঁকে এমন এক পবিত্র কক্ষে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যা *"পবিত্রতম স্থান"* নামে পরিচিত
ছিল যেখানে প্রধান পুরোহিত ব্যতীত কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আর সেই কক্ষেই তাঁর নিকট আসমান থেকে খাদ্য নাযিল হতো।

যখন মারইয়াম (আঃ) বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছালেন অর্থাৎ শারীরিকভাবে একজন নারী হয়ে উঠলেন তখন তিনি আর মসজিদ এ বসবাস করতে পারলেন না; তাঁকে তাঁর পিতা-মাতার কাছে ফিরে যেতে হলো। এর কারণ ছিল এই যে, ঋতুস্রাবের রক্ত মসজিদকে অপবিত্র করতে পারত, এবং ইহুদি পুরোহিতদের (রাব্বিদের) দায়িত্ব ছিল যেন এমন কিছু না ঘটে তা নিশ্চিত করা।

তাছাড়া, বয়ঃসন্ধির সাথে মানুষের ভেতরে যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়; তাই কোনো কন্যা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন তাকে বিশেষ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার মধ্যে রাখতে হয়।
যখন তিনি শিশু ছিলেন, তখন যাকারিয়া (আঃ) সহজেই তাঁর অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন; কিন্তু এখন তিনি পরিণত নারী হয়ে গেছেন, তাই যাকারিয়া (আঃ)-এর পক্ষে পূর্বের মতো অভিভাবকত্ব চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায়

মারইয়াম (আঃ)-এর পিতা-মাতার ওপরই তাঁর হেফাজত ও সুরক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হলো।

এভাবেই এমন এক সময়ে, যখন তিনি সর্বোচ্চ নৈতিক ও ধর্মীয় মর্যাদায় ছিলেন, এবং যদিও তাঁর বয়স সম্ভবত মাত্র ১৩ বা ১৪ বছর ছিল এবং তিনি তখনও অবিবাহিত ছিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা জিবরাইলকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন এই খবর জানাতে যে তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবে, যিনি হবেন মসীহ।

উপরের উক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলকে সেই চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করেছিলেন, যখন সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদাসম্পন্ন একজন কুমারী, যিনি তখনও অবিবাহিত ছিলেন, একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন যিনি ছিলেন মসীহ।

নীচের আয়াতগুলো (সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৫-৪৭) স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে মসীহ ঈসা (আঃ) কুমারী মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন।

اِذۡ قَالَتِ الۡمَلٰٓئِکَۃُ یٰمَرۡیَمُ اِنَّ اللّٰہَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَۃٍ مِّنۡہُ ۖ اسۡمُہُ الۡمَسِیۡحُ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ وَجِیۡہًا فِی الدُّنۡیَا وَ الۡاٰخِرَۃِ وَ مِنَ الۡمُقَرَّبِیۡنَ

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল, 'হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, যে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'

সূরা আলে ইমরান ৩:৪৫

وَ یُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الۡمَہۡدِ وَ کَہۡلًا وَّ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ

আর সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনায় ও পরিণত বয়সে এবং সে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা আলে ইমরান ৩:৪৬

قَالَتۡ رَبِّ اَنّٰی یَکُوۡنُ لِیۡ وَلَدٌ وَّ لَمۡ یَمۡسَسۡنِیۡ بَشَرٌ ؕ قَالَ کَذٰلِکِ اللّٰہُ یَخۡلُقُ مَا یَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰۤی اَمۡرًا فَاِنَّمَا یَقُوۡلُ لَہٗ کُنۡ فَیَکُوۡنُ

মারইয়াম বলল, 'হে আমার রব, কিভাবে আমার সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি'! আল্লাহ বললেন, 'এভাবেই' আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে শুধু বলেন, 'হও'। ফলে তা হয়ে যায়।

সূরা আলে ইমরান ৩:৪৭

কুরআনের সূরা মারইয়ামের (১৯:১৬–২১) এই মনোমুগ্ধকর অংশটি এটাও নিশ্চিত করে যে, ফেরেশতা জিবরীল যখন মারইয়ামের কাছে এসে তাঁকে এক পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দেন, তখনও তিনি কুমারী অবস্থায় ছিলেন।

وَ اذۡكُرۡ فِى الۡكِتٰبِ مَرۡيَمَ اِذِ انۡتَبَذَتۡ مِنۡ اَهۡلِهَا مَكَانًا شَرۡقِيًّا

আর স্মরণ কর এই কিতাবে মারইয়ামকে যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের কোন এক স্থানে চলে গেল।

সূরা মারইয়াম ১৯:১৬

فَاتَّخَذَتۡ مِنۡ دُوۡنِهِمۡ حِجَابًا فَاَرۡسَلۡنَاۤ اِلَيۡهَا رُوۡحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

আর সে তাদের নিকট থেকে (নিজকে) আড়াল করল। তখন আমি তার নিকট আমার রূহ (জিবরীল) কে প্রেরণ করলাম। অতঃপর সে তার সামনে পূর্ণ মানবের রূপ ধারণ করল।

সূরা মারইয়াম ১৯:১৭

قَالَتۡ اِنِّىۡۤ اَعُوۡذُ بِالرَّحۡمٰنِ مِنۡكَ اِنۡ كُنۡتَ تَقِيًّا

মারইয়াম বলল, 'আমি তোমার হতে দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর' (তবে আমার নিকট এসো না)।'

সূরা মারইয়াম ১৯:১৮

قَالَ اِنَّمَاۤ اَنَا رَسُوۡلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا

সে বলল, 'আমি তো কেবল তোমার রবের বার্তাবাহক, তোমাকে একজন পবিত্র পুত্রসন্তান দান করার সুসংবাদ নিয়ে *এসেছি'*

সূরা মারইয়াম ১৯:১৯

قَالَتۡ اَنّٰی یَکُوۡنُ لِیۡ غُلٰمٌ وَّ لَمۡ یَمۡسَسۡنِیۡ بَشَرٌ وَّ لَمۡ اَکُ بَغِیًّا

মারইয়াম বলল, 'কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। আর আমি তো ব্যভিচারিণীও নই'।

সূরা মারইয়াম ১৯:২০

قَالَ کَذٰلِکِ قَالَ رَبُّکِ ہُوَ عَلَیَّ ہَیِّنٌ وَ لِنَجۡعَلَہٗۤ اٰیَۃً لِّلنَّاسِ وَ رَحۡمَۃً مِّنَّا وَ کَانَ اَمۡرًا مَّقۡضِیًّا

সে বলল, 'এভাবেই। তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ। আর যেন আমি তাকে করে দেই মানুষের জন্য নিদর্শন এবং আমার পক্ষ থেকে রহমত। আর এটি একটি সিদ্ধান্তকৃত বিষয়'।

সূরা মারইয়াম ১৯:২১

মারিয়ামের সেই উত্তর—"আমার সন্তান কীভাবে হবে, যখন কোনো পুরুষই আমাকে স্পর্শ করেনি? আর আমি তো কখনোই কোনো ব্যভিচারিণী নারী ছিলাম না!"—যেকোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষের জন্য এটাই উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট যে, তিনি তাঁর পুত্রসন্তানকে গর্ভে ধারণ করার সময়ও কুমারীই ছিলেন।

ইতিহাসের সেই মহিমান্বিত মাহেন্দ্রক্ষণ অবশেষে সমাগত হলো, যখন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মসীহের জন্ম হওয়ার কথা। আর বনী ইসরাঈলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এমন এক অগ্নিপরীক্ষার মঞ্চ, যার সম্মুখীন তারা পূর্বে আর কখনো হয়নি।

মারিয়াম এবং দোলনায় এক নবজাতক শিশু

যে মেয়েটি তখনও কুমারী ছিল, তার এই অলৌকিক গর্ভধারণের কথাই কুরআন উল্লেখ করছিল (সূরা মারিয়াম, ১৯:২১)। যখন এটি মসীহের জন্মকে একটি ঐশ্বরিক নিদর্শন হিসাবে ঘোষণা করে, যা ছিল এক পরীক্ষা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈল জাতিকে পরীক্ষা করেছিলেন।

...وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ...

"...যাতে আমরা তাকে মানবজাতির জন্য একটি নিদর্শন (ঐশ্বরিক চিহ্ন) বানাতে পারি।"

সূরা মারইয়াম ১৯:২১

এই মুহূর্তটি ছিল বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে এবং সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। সেই জাতির, যাদের দেখার জন্য দুটি চোখ থাকা উচিত ছিল—একটি বাহ্যিক দৃষ্টির জন্য, অন্যটি অন্তর্দৃষ্টির জন্য—তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলো যে, এই শিশুর জন্ম সাধারণ ঘটনার চেয়েও অনেক গভীর তাৎপর্য বহন করে। তারা আল্লাহর পরীক্ষা ফেল করল এবং ভুলভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে মারইয়াম পাপ করেছেন এবং যে শিশু, জন্মেছেন, তিনি অবৈধ।

সুরা আত-তাহরীম মারইয়ামের কুমারিত্ব নিশ্চিত করেছে যখন তিনি মসীহকে ধারণ করেছিলেন।

وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ

“আমরা আল্লাহভীরুতার আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—ইমরানের কন্যা মারইয়ামের গল্পে। তিনি ইমরানের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একজন কন্যা ছিলেন, যিনি সম্পূর্ণ সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন (অতএব এখনও অবিবাহিত কুমারী ছিলেন)। তখন আমরা আমাদের আত্মা (রূহ) তার গর্ভে প্রেরণ করলাম। মারইয়াম তাঁর প্রতিপালক আল্লাহর বাক্য এবং প্রেরিত নিদর্শনগুলো বিশ্বাস করলেন এবং সত্যিই ধার্মিক ও ভীরুদের অন্তর্ভুক্ত হলেন।”

কুরআন, সুরা আত-তাহরীম, ৬৬:১২

কুরআন আরও পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, মারইয়াম জানতেন তিনি এমন এক সন্তানের জন্ম দেবেন, যিনি হবেন মসীহ, আর তিনি আল্লাহ্র এই ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এও জানতেন যে, তাঁর শিশুটি দোলনা থেকেই অলৌকিকভাবে কথা বলবে। আর তাই, শিশুটির জন্মের পর, তিনি তাঁকে নিয়ে তাঁর লোকদের কাছে ফিরে এলেন, এক ঐশ্বরিক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে। ইতিহাস অবশ্যই সেই শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্তে থমকে গিয়েছিল, যখন একটি জাতি, যারা হাজার হাজার বছর ধরে তাদের মসীহের জন্য অপেক্ষা করছিল, তারা এখন তাদের সেই মসীহকে দেখবে এক নবজাতক শিশু হিসেবে, যে দোলনায় শুয়ে আছে।
যখন মারিয়াম এক নবজাতক পুত্রসন্তান নিয়ে তাদের কাছে ফিরে এলেন, তখনও তিনি অবিবাহিত ছিলেন, তখন তারা তাকে যেভাবে আক্রমণ করেছিল তাতে তাদের

ভয়াবহ আত্মিক অন্ধত্ব প্রকাশ পায়। যখন তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল, তিনি শিশুটির দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং তাদের চোখের সামনেই ইতিহাস উন্মোচিত হলো যখন নবজাতক শিশুটি অলৌকিকভাবে দোলনা থেকে কথা বলে তার মায়ের পক্ষ সমর্থন করল। আমরা সূরা মারিয়াম, ১৯:২৭-৩৩ এ ফিরে যাব সেই ঘটনার আয়াত-ভিত্তিক বিবরণের জন্য:

فَاَتَتۡ بِهٖ قَوۡمَهَا تَحۡمِلُهٗ ؕ قَالُوۡا یٰمَرۡیَمُ لَقَدۡ جِئۡتِ شَیۡئًا فَرِیًّا

অতঃপর সে তার সন্তানকে বয়ে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে আসল। তারা বলল, 'হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত জিনিস নিয়ে এসেছ!

সূরা মারিয়াম ১৯:২৭

یٰۤاُخۡتَ هٰرُوۡنَ مَا کَانَ اَبُوۡکِ امۡرَ اَ سَوۡءٍ وَّ مَا کَانَتۡ اُمُّکِ بَغِیًّا

'হে হারূনের বোন! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না। আর তোমার মা-ও ছিল না ব্যভিচারিণী'।

সূরা মারিয়াম, ১৯:২৮

মারিয়াম যদি বিবাহিত হতেন, তাহলে তাঁর সন্তান জন্মানোর ঘটনায় ইসরাঈলীরা এতটা অবাক ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া কেন দেখাল? তাদের এই হতবাক হওয়ার পেছনের একমাত্র কারণ হতে পারে, সন্তানটি বিবাহের বাইরে জন্মেছিল! শুধু তাই নয়, তিনি সন্তানের জন্মের সময় তো অবিবাহিত ছিলেনই, এরপরও তিনি যে কখনো বিয়ে করেছিলেন, তার কোনো প্রমাণ নেই।

আর ঠিক একারণেই আমরা মনে করি, অর্থোডক্স খ্রিস্টান চার্চ এবং অন্য যারা এই বিশ্বাসকে মানে না যে ঈসার (আঃ) কোনো ভাইবোন ছিল, তারাই সঠিক।

فَاَشَارَتۡ اِلَیۡهِ ؕ قَالُوۡا کَیۡفَ نُکَلِّمُ مَنۡ کَانَ فِی الۡمَهۡدِ صَبِیًّا

তখন মারইয়াম তার ছেলের দিকে ইশারা করল। তারা বলল, 'আমরা কোলের বাচ্চার সঙ্গে কীভাবে কথা বলব?'

সূরা মারিয়াম, ১৯:২৯

قَالَ اِنِّیۡ عَبۡدُ اللّٰهِ ۟ اٰتٰنِیَ الۡکِتٰبَ وَ جَعَلَنِیۡ نَبِیًّا

(শিশুটি) বলল,

“নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন।”

সূরা মারিয়াম, ১৯:৩০

وَّ جَعَلَنِیۡ مُبٰرَکًا اَیۡنَ مَا کُنۡتُ ۪ وَ اَوۡصٰنِیۡ بِالصَّلٰوۃِ وَ الزَّکٰوۃِ مَا دُمۡتُ حَیًّا

“আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় আমি যেখানেই থাকি না কেন; এবং তিনি আমাকে আদেশ করেছেন সালাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে, যতদিন আমি জীবিত থাকব।”

সূরা মারিয়াম, ১৯:৩১

وَّ بَرًّۢا بِوَالِدَتِیۡ ۫ وَ لَمۡ یَجۡعَلۡنِیۡ جَبَّارًا شَقِیًّا

‘আর আমাকে মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে অহঙ্কারী, অবাধ্য করেননি’।

সূরা মারিয়াম, ১৯:৩২

وَ السَّلٰمُ عَلَیَّ یَوۡمَ وُلِدۡتُّ وَ یَوۡمَ اَمُوۡتُ وَ یَوۡمَ اُبۡعَثُ حَیًّا

অতএব, শান্তি ছিল আমার উপর যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম, এবং যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব (অর্থাৎ, যেদিন আল্লাহ আমার রূহ নিয়ে নেবেন এবং তা ফিরিয়ে দেবেন না), এবং যেদিন আমাকে [পুনরায়] জীবিত করে তোলা হবে!"

সূরা মারিয়াম, ১৯:৩৩

একটি নবজাতক শিশুর মুখে এটি ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ, গভীর ও অলৌকিক এক বক্তৃতা। আর যদি কুরআন নাযিল না হতো, তবে শিশু ঈসা (আঃ)-এর বলা এই মহিমান্বিত বাক্যগুলো
এবং তাঁর অলৌকিক জন্ম ও ঘটনাবলী সম্পর্কিত আরও বহু তথ্য ইতিহাসের গহীনে হারিয়ে যেত।
নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-ও কখনো এসব জানতে পারতেন না, যদি না আল্লাহ তা সর্বশেষ ওহি আল-কুরআনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি প্রকাশ করতেন।

ذٰلِكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الۡغَيۡبِ نُوۡحِيۡهِ اِلَيۡكَ ۚ وَ مَا كُنۡتَ لَدَيۡهِمۡ اِذۡ يُلۡقُوۡنَ اَقۡلَامَهُمۡ اَيُّهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيَمَ ۚ وَ مَا كُنۡتَ لَدَيۡهِمۡ اِذۡ يَخۡتَصِمُوۡنَ

এসব অদৃশ্যের সংবাদ, আমি তোমার কাছে তা ওয়াহী দ্বারা পৌঁছে দিচ্ছি। বস্তুতঃ তুমি তাদের নিকট উপস্থিত ছিলে না যখন তাদের কোন্ ব্যক্তি মারইয়ামকে লালন-পালন করবে সেই ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য কলম নিক্ষেপ করছিল এবং তুমি তাদের নিকট উপস্থিত ছিলে না, যখন তারা (মারইয়ামের অভিভাবক কে হবে তা নিয়ে) বাদানুবাদ করছিল।

সূরা আলে ইমরান ৩:৪৪

ইসরায়েলীরা দোলনায় শুয়ে শিশুর কথা বলার অলৌকিক ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করে এটিকে নিছক জাদু বলে ঘোষণা করেছিল। এর মাধ্যমে তারা ভয়ানক আত্মিক অন্ধত্বের পরিচয় দিয়েছিল।

আরও বিস্ময়কর বিষয় হলো, যে জাতি নিজেদেরকে আল্লাহ্র মনোনীত জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং যারা সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছিল যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ইসরায়েলি কন্যা মারইয়ামের গর্ভে একটি শিশুর জন্ম হয়েছে—তারাই তাকে ইসরায়েলি আদালতে হাজির করার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেনি, যাতে তার অবিবাহিত অবস্থায় জন্ম দেওয়া শিশুটির বিষয়ে আইনানুগ কোনো রায় দেওয়া যায়।

তাদের কথায় লুকিয়ে ছিল ব্যভিচারের অভিযোগ:

> *"হে হারুনের বোন! তোমার পিতা কখনো পাপী ছিলেন না, এবং তোমার মাতাও কখনো অশ্লীল নারী ছিলেন না।"*

তবে তওরাহ স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছিল যে জিনার (বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক) শাস্তি হলো পাথর দিয়ে মারা। তাদের সম্ভবত মারইয়ামকে আদালতে তোলা সম্ভব হয়নি, কারণ সেই মামলা সমাজে অত্যন্ত আলোচিত হত এবং সবাই লক্ষ্য করত যে, তারা শত শত বছর ধরে তওরাহকে ধোঁকা দিয়েছে।
কারণ তওরাহতে জিনার (ব্যভিচার) শাস্তি **পাথর দিয়ে মৃত্যুদণ্ড** হিসেবে নির্ধারিত ছিল। কিন্তু তারা আল্লাহর এই আইনকে এড়িয়ে নিজেদের তৈরি নতুন আইন প্রয়োগ করেছিল অপরাধীর মুখ কালো করা এবং জনসমক্ষে প্রহার করা।

ঈসা ইবনে মারিয়াম প্রকৃত মসীহ

কুরআনে 'মসীহ' শব্দটির পরিষ্কার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে, এটি পরিষ্কারভাবে কুমারী মারিয়ামের পুত্র ঈসা, অর্থাৎ নবী ঈসাকে (আঃ) 'আল-মসীহ' বা মসীহ হিসেবে চিহ্নিত করে। তাঁকে এমন সব বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যা তাঁকে সৃষ্টিজগতের সবার থেকে একেবারেই আলাদা করে তুলেছে। কুরআন আমাদের জানিয়েছে যে ঈসাকে (আঃ) পবিত্র আত্মা, অর্থাৎ 'রূহ আল-কুদুস' দ্বারা সাহায্য করা হয়েছিল। কুরআন আরও পরিষ্কারভাবে এই পবিত্র আত্মাকে প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈল হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

...وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ...

...এবং আমি মারিয়ামের পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়েছিলাম এবং তাকে পবিত্র আত্মা (রূহুল কুদুস) দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম...

সূরা বাকারা, আয়াত ২:২৫৩

কুরআন অনুযায়ী, আল্লাহ তায়ালা ঈসাকে যে পবিত্র আত্মা (রূহ আল-কুদুস) দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তিনি হলেন ফেরেশতা জিবরাঈল। এই জিবরাঈলই নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে কুরআন নিয়ে এসেছিলেন।

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

বল, 'এ কুরআন তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রুহুল কুদূস (জিবরীল) ঠিক ঠিকভাবে নাযিল করেছেন ঈমানদারদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এবং মুসলিমদের হিদায়াত ও সুসংবাদ দানের জন্য।'

সূরা আন-নাহল, আয়াত ১০২

সম্ভবত এই কারণেই যে ফেরেশতা (রূহুল কুদুস) সর্বদা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁকে স্পর্শ করতেন এবং এর মাধ্যমে তাঁকে শক্তি দিতেন তিনি "আল-মসীহ" (মসীহ) নামে পরিচিত হয়েছেন, অর্থাৎ "যিনি স্পর্শিত"। আর আল্লাহই সর্বাধিক জানেন!

হিব্রু শব্দ "মাশিয়াখ" (Mashiach)-এর অর্থ হলো মাখা, প্রলেপ দেওয়া বা অভিষিক্ত করা

কুরআন আরও জানিয়েছে যে, ঈসা (আ.) পবিত্র আত্মার মাধ্যমে শক্তিশালী হয়েছিলেন বলেই শিশুকালেই অলৌকিকভাবে কথা বলতে পেরেছিলেন। আর এই কারণেই তিনি পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় পর আবার ফিরে এসে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে অলৌকিকভাবে কথা বলতে পারবেন।

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا

...যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে মারিয়ামের পুত্র ঈসা, আমার সেই নেয়ামত স্মরণ করো যা তোমার উপর ও তোমার মাতার উপর ছিল; যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা দিয়ে শক্তিশালী করেছিলাম, তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে...'

সূরা আল-মাইদাহ ৫:১১০

এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ),দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় পর যখন অলৌকিকভাবে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, তখন তিনি সবার আগে নবী মুহাম্মদ(ﷺ)-এর শেখানো নিয়ম অনুযায়ী নামাজ পড়বেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করে দেবেন যে, এই কুরআন আল্লাহর কাছ থেকে আসা আসল কিতাব, যা কোনো রকম পরিবর্তন হয়নি। তিনি আরও নিশ্চিত করবেন যে,
কুরআন তাঁর এবং আল্লাহ সম্পর্কে যা কিছু বলেছে, তা সবই খাঁটি সত্য। এছাড়াও, তিনি প্রমাণ করবেন যে নবী মুহাম্মদ (ﷺ) সত্যিই আল্লাহর নবী ছিলেন এবং তিনিই শেষ নবী।

এখানে কুরআনের একটি আয়াত দেওয়া হলো যা মারিয়ামের পুত্র ঈসাকে, অর্থাৎ নবী ঈসাকে(আঃ), মসীহ হিসেবে চিহ্নিত করে:

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল, 'হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, যে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'।

সূরা আলে ইমরান ৩:৪৫

কুরআন আরও ব্যাখ্যা করে এবং সতর্ক করে দিয়েছে যে, মসীহ কোনোভাবেই ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের অংশ নন, এবং ত্রিত্ববাদ এরও অংশ নন; তিনি "ঈশ্বরের পুত্র" নন। বরং তিনি একজন রসূল, একজন বার্তাবাহক, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ঐশী বার্তা নিয়ে এসেছিলেন।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۫ وَ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ঈসা কেবলমাত্র আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না, 'তিন'। তোমরা বিরত হও, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহই কেবল এক ইলাহ, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর কোন সন্তান হবে। আসমানসূহে যা রয়েছে এবং যা রয়েছে যমীনে, তা আল্লাহরই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

সূরা আন-নিসা ৪:১৭১

মসীহ কেবলমাত্র একজন মানুষ।

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

"[ঈসা (আঃ) কেবল] আমাদের একজন দাস, যাকে আমরা নবুওয়াতের মর্যাদা দিয়েছি, এবং যাকে আমরা বনী ইসরাইলের জন্য একটি উদাহরণ (এবং এক পরীক্ষা) বানিয়েছি।"

সূরা আল-জুখরুফ ৪৩:৫৯

এরপর কুরআন তাদের কঠোর সমালোচনা করেছে, যারা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর সত্তার অংশ বলে মনে করে। কুরআন ঘোষণা করেছে যে, তারা কুফরি করেছে। আয়াতটিতে স্বয়ং ঈসা (আঃ)-এর সতর্কবাণী তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে তিনি তাঁর ইসরায়েলি অনুসারীদের বলেছেন যেন তারা তাঁর আল্লাহর ইবাদত করে, যিনি তাদেরও আল্লাহ্। আর এই ধরনের কুফরি থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, কারণ এর পরিণতি হবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার হারানো এবং জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ হওয়া।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَ قَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ ۗ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ۗ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

তারা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা বলে, মারইয়াম পুত্র মাসীহই হচ্ছেন আল্লাহ। মাসীহ তো বলেছিল, হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

সূরা আল-মায়িদা ৫:৭২

মসীহের অলৌকিক ঘটনাবলী

আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আঃ)-কে তাঁর পক্ষ থেকে অনেক নিদর্শন (মোজেজা) দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যা দিয়ে তিনি বনি ইসরাঈলকে বারবার পরীক্ষা করেছেন। এটা খুবই অবাক করার মতো বিষয় যে, বনি ইসরাঈল, যাদের মাঝে আল্লাহর নবীরা সব সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তারা আল্লাহর অশেষ রহমত পেয়েছিলেন, তারা ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে বারবার দেখানো আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এখানে তাঁর কিছু অলৌকিক ঘটনা দেওয়া হলো:

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَ عَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا ۗ وَ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ۗ وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ

الطَّيۡرِ بِاِذۡنِىۡ فَتَنۡفُخُ فِيۡهَا فَتَكُوۡنُ طَيۡرًا بِاِذۡنِىۡ وَ تُبۡرِئُ الۡاَكۡمَهَ وَ الۡاَبۡرَصَ بِاِذۡنِىۡ
وَ اِذۡ تُخۡرِجُ الۡمَوۡتٰى بِاِذۡنِىۡ وَ اِذۡ كَفَفۡتُ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ عَنۡكَ اِذۡ جِئۡتَهُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡهُمۡ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا سِحۡرٌ مُّبِيۡنٌ

যখন আল্লাহ বলেন, "হে 'ঈসা বিন মারইয়াম! তুমি তোমার প্রতি আর তোমার মায়ের প্রতি আমার নি'মাতের কথা স্মরণ কর। আমি তোমাকে রূহুল কুদুর (জিবারাঈল) দিয়ে শক্তিশালী করেছি, তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় আর পূর্ণ বয়সেও মানুষের সাথে কথা বলেছ। স্মরণ কর আমি তোমাকে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি আমার অনুমতিক্রমে মাটি দ্বারা পাখীর মত আকৃতি গঠন করতে আর তাতে ফুঁক দিতে তখন তা আমার হুকুমে পাখী হয়ে যেত, জন্মান্ধ আর কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তুমি আমার হুকুমে আরোগ্য করতে, স্মরণ কর আমার হুকুমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে, স্মরণ কর যখন আমি তোমার থেকে বানী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম যখন তুমি তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে আসলে, তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলল- "এটা তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।"

সূরা আল-মাইদাহ ৫:১১০

وَ رَسُوۡلًا اِلٰى بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ۬ۙ اَنِّىۡ قَدۡ جِئۡتُكُمۡ بِاٰيَةٍ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ ۙ اَنِّىۡۤ اَخۡلُقُ لَكُمۡ مِّنَ الطِّيۡنِ كَهَيۡـَٔةِ الطَّيۡرِ فَاَنۡفُخُ فِيۡهِ فَيَكُوۡنُ طَيۡرًا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُبۡرِئُ الۡاَكۡمَهَ وَ الۡاَبۡرَصَ وَ اُحۡىِ الۡمَوۡتٰى بِاِذۡنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُنَبِّئُكُمۡ بِمَا تَاۡكُلُوۡنَ وَ مَا تَدَّخِرُوۡنَ ۙ فِىۡ بُيُوۡتِكُمۡ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ

'আর তিনি তাকে বানী ইসরাঈলের নিকট রসূল হিসেবে প্রেরণ করবেন'। সে বলবে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট এসেছি, আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখীর মত একটা কায়া গঠন করব, অতঃপর তাতে ফুঁৎকার দেব, ফলে আল্লাহর হুকুমে তা পাখি হয়ে যাবে এবং আল্লাহর হুকুমে আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করব ও আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করব এবং আমি তোমাদেরকে বলে দেব তোমাদের গৃহে তোমরা যা আহার কর এবং সঞ্চয় করে রাখ; নিশ্চয়ই এ কাজে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মু'মিন হও।'

সূরা আলে ইমরান,আয়াত ৪৯

কুরআন আমাদের জানিয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পবিত্র আত্মা অর্থাৎ ফেরেশতা জিবরাঈল দ্বারা শক্তিশালী করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ তিনি এই সমস্ত অলৌকিক কাজ সম্পাদন করতে পেরেছিলেন:

...وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ...

...এবং আমি মারিয়ামের পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়েছিলাম এবং তাকে পবিত্র আত্মা (রূহুল কুদুস) দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম...

সূরা বাকারা, আয়াত ২:২৫৩

উপরের ঈসা (আঃ)-এর একটি অলৌকিক নিদর্শনে একটি খুব স্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায়, যে একজন মানুষের আত্মা শরীর থেকে বের হয়ে যায়, এবং তাই সে যেন মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করে, কিন্তু পরে আবার জীবিত হয়ে ফিরে আসে। অর্থাৎ, এমন একজন মানুষ মারা গেছে বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে সে মারা যায়নি।

وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

"... এবং আমি আল্লাহর অনুমতিতে মৃতদের জীবিত করেছি ..."

সূরা আলে ইমরান,আয়াত ৪৯

পাঠকদের প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ঈসা (আঃ) কীভাবে মৃতদের জীবিত করলেন, যেখানে আল্লাহ নিজেই নির্দেশ দিয়েছেন যে তিনি মৃত আত্মাদের আটকে রাখেন এবং তাদের ফিরে আসতে দেন না? এটা কি আল্লাহর বাণীর বিরুদ্ধে যায় না? এই প্রশ্নের উত্তর কুরআনের সূরা জুমার- একটি আয়াতে আছে।

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি মৃত্যুর সময় আত্মাগুলিকে তুলে নেন (অর্থাৎ কবজ করেন); আর যাদের মৃত্যু নির্ধারিত হয়নি, তাদের (আত্মা) ঘুমের সময় তুলে নেন। এরপর যাদের মৃত্যুর ফয়সালা তিনি করেছেন, তাদের (আত্মা) তিনি আটকে রাখেন, আর

অন্যদের (আত্মা) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফেরত পাঠান। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

সূরা আয-যুমার, ৩৯:৪২

আয়াতটি স্পষ্টভাবে বলছে যে, মৃত্যুর সময় আল্লাহ সবার আত্মা নিয়ে নেন। কিন্তু কুরআন আরও বলছে যে, কিছু মানুষের আত্মা ঘুমের সময় নেওয়া হলেও তারা আসলে মারা যায় না। এর কারণ হলো, আল্লাহ যাদের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন, তাদের আত্মাকে নিজের কাছে রেখে দেন, আর অন্যদের আত্মাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবার শরীরে ফিরিয়ে দেন।

কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ যখন কারো আত্মা নিয়ে নেন এবং নিজের কাছে রেখে দেন, তখন সে আর জীবিত হতে পারে না। কিন্তু কুরআন এও বলে যে, আল্লাহ চাইলে কোনো আত্মা নিয়ে আবার তা ফিরিয়ে দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে সেই আত্মা আসলে মরে না।

অতএব, এখানে রয়েছে বাস্তব মৃত্যু (মৌত) আর রয়েছে এমন এক অবস্থা, যা মৃত্যুর মতো মনে হয়, কিন্তু আসলে তা মৃত্যু নয়!

খ্রিস্টানদের জন্য ঈসা (আ.) কর্তৃক মৃতদের জীবিত করার অলৌকিক ঘটনাগুলোর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা মোটেও কঠিন হওয়া উচিত নয়।

ঘটনাটা এমন ছিল আল্লাহ তায়ালা তাঁদের আত্মা তুলে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের মৃত্যু নির্ধারণ করেননি। তারপর আল্লাহর অনুমতিতে ঈসা (আঃ) সেই আত্মাগুলোকে আবার তাঁদের দেহে ফিরিয়ে দেন,আর তখনই তারা জীবিত হয়ে ওঠে।

ইস্রায়েলিদের মহান বিভক্তি

ঈসা (আ.)-এর অলৌকিকভাবে জন্ম, শিশুকালেই কথা বলা, তাঁর অসংখ্য মোজেজা দেখানো, এবং পরবর্তীতে প্রকাশ্যে নিজেকে বনি ইসরাঈলের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে ঘোষণা করা এরপর সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ছিল যখন তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় দেখেছিল এবং তারপরই তিনি আপাত মৃত্যু থেকে আবার জীবিত

হয়ে উঠেছিলেন। এই সবগুলো ঘটনা বনি ইসরাঈল জাতির জন্য এক চরম পরীক্ষা ছিল।
কুরআন প্রকাশ করেছে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈসা (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে বিশ্বাস করেছিল, আর বাকিরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল:

وَّ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا

আর তাদের কুফরীর কারণে এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে মারাত্মক অপবাদ দেয়ার কারণে

সূরা নিসা, ৪:১৫৬

ঠিক এই সময়েই বনি ইসরাঈলের মধ্যে এক বড় বিভেদ দেখা দেয়। যে অংশ ঈসা (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ তায়ালা তাদের 'আন-নাসারা' (খ্রিস্টান) নাম দিলেন। আর যারা তাঁকে মসীহ হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছিল, কুরআন তাদের 'আল-ইয়াহুদ' (ইহুদি) নামে অভিহিত করল।
কুরআনে তাদের আর 'বনি ইসরাঈল' বা এক জাতি হিসেবে ডাকা হয়নি। বরং, তাদের এখন 'আহলুল কিতাব' অর্থাৎ আসমানী কিতাবের অনুসারী দুটি ভিন্ন জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই নামের পরিবর্তন থেকে একটি বিষয় বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা এই বিভেদকে চিরস্থায়ী হিসেবে দেখেছেন। এর মানে হলো, খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা আর কখনোই এমনভাবে এক হতে পারবে না, যাতে তাদের আগের ঐক্য ফিরে আসে।

খ্রিস্টানদের উপর মহা আক্রমণ

কুমারী মায়ের গর্ভে ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক জন্ম, তাঁর দেখানো নানা মোজেজা এবং আপাত মৃত্যু থেকে আবার জীবিত হয়ে ওঠা এই ঘটনাগুলো তাদের জন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল, যারা সত্যকে বিকৃত করতে চাইছিল। তারা এই যুক্তি ছড়াতে শুরু করল যে, যেহেতু ঈসা (আঃ)-এর কোনো পার্থিব বাবা ছিলেন না, তার মানে তাঁর একজন আসমানী বাবা আছেন অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ

তায়ালা তাঁর পিতা। তাই, ঈসাকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে মানা উচিত; আর যেহেতু পিতা আল্লাহ (ঐশ্বরিক), সেহেতু পুত্রও ঐশ্বরিক হবে আর এভাবেই তিনি 'আল্লাহর পুত্র' হয়ে গেলেন!

প্রকৃতপক্ষে, ঈসা (আঃ)-কে ঈশ্বরের মর্যাদা দেওয়ার পরও এই তর্ক ও আক্রমণ থেমে যায়নি। বরং এটি অব্যাহত থাকে এমনভাবে যে, পরবর্তীতে পবিত্র আত্মাকেও (রূহুল কুদুস) ঈশ্বর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এর ফলে জন্ম নেয় "ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা" ধারণা।

কুরআন ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, তিনি, অর্থাৎ মসীহ, আল্লাহর একজন রাসূল (বার্তাবাহক) ছাড়া আর কিছুই নন। তাদের উচিত ত্রিত্ববাদের ধারণায় তাঁকে ঐশ্বরিক সত্তায় উন্নীত করা থেকে বিরত থাকা।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۫ وَ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ঈসা কেবলমাত্র আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না, 'তিন'। তোমরা বিরত হও, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহই কেবল এক ইলাহ, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর কোন সন্তান হবে। আসমানসূহে যা রয়েছে এবং যা রয়েছে যমীনে, তা আল্লাহরই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

সূরা আন-নিসা ৪:১৭১

কুরআন ঘোষণা করেছে যে, মসীহ ঈসা (আঃ) প্রভুর একজন বান্দা হিসেবে নিজেকে গর্বিত মনে করতেন।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَ لَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَ مَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا

মাসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না, আর নৈকট্যের অধিকারী ফেরেশতারাও না। যে তাঁর 'ইবাদাতকে হেয় জ্ঞান করে আর অহঙ্কার করে, তিনি তাদের সকলকে শীঘ্রই তাঁর কাছে একত্রিত করবেন।

সূরা আন-নিসা ৪:১৭২

কুরআন তাদের সতর্ক করেছে যারা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ বলে ঘোষণা করে, যে এর মাধ্যমে তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّهٗ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

তারা কুফরী করেছে যারা বলে মাসীহ্ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ। বল, মাসীহ ইবনে মারইয়াম, আর তার মা এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলকে ধ্বংস করতে চাইলে আল্লাহর বিরুদ্ধে কারো এতটুকু ক্ষমতা আছে কি? আসমানসমূহে আর পৃথিবীতে ও এদের মধ্যে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই মালিকানাধীন। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা মায়িদাহ ৫:১৭

মসীহ নিজেই সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করে এবং মসীহকে আল্লাহ ঘোষণা করবে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَ قَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبَّكُمْ ۗ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ۗ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

তারা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা বলে, মারইয়াম পুত্র মাসীহই হচ্ছেন আল্লাহ। মাসীহ তো বলেছিল, হে বানী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

সূরা আল-মায়িদা ৫:৭২

কুরআনে মসীহের (ঈসা আঃ) কথা এমনভাবে বলা হয়েছে যে, তাঁর আগের নবীগণ যেমন মারা গেছেন, তেমনি তিনিও (পৃথিবীতে ফিরে আসার পর) মারা যাবেন। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি একজন মানুষ। তাঁর মানবতা আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা দেখি যে, তিনি এবং তাঁর মা খাবার খেতেন।

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)

মারইয়াম পুত্র ‘ঈসা রসূল ছাড়া কিছুই ছিল না। তার পূর্বে আরো রসূল অতীত হয়ে গেছে, তার মা ছিল সত্যপন্থী মহিলা, তারা উভয়েই খাবার খেত; লক্ষ্য কর তাদের কাছে (সত্যের) নিদর্শনসমূহ কেমন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছি আর এটাও লক্ষ্য কর যে, কীভাবে তারা (সত্য হতে) বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে।

সূরা আল-মায়িদা ৫:৭৫

কুরআন প্রকাশ করেছে যে, খ্রিস্টানরা মসীহকে আল্লাহর পুত্র ঘোষণা করে যেমন আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করেছে, তেমনি ইহুদিরাও উযাইরকে আল্লাহর পুত্র ঘোষণা করে তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছে:

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨ ابْنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

ইয়াহূদীরা বলে, ‘উযায়র আল্লাহর পুত্র। আর নাসারারা বলে, ‘মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এসব তাদের মুখের কথা। এতে তারা তাদের পূর্বেকার কাফিরদের কথারই অনুকরণ করে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! কেমনভাবে তারা সত্য পথ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে।

সূরা তাওবাহ ৯:৩০

শেষ পর্যন্ত, কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, মসীহের (ঈসা আঃ) ঐশ্বরিক মর্যাদা দাবি করা হল বড় শির্ক এবং কুফর অর্থাৎ স্পষ্ট ধর্মদ্রোহিতা।

اِتَّخَذُوۡۤا اَحۡبَارَهُمۡ وَ رُهۡبَانَهُمۡ اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَ الۡمَسِيۡحَ ابۡنَ مَرۡيَمَ ۚ وَ مَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِيَعۡبُدُوۡۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبۡحٰنَهٗ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের 'আলিম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে; আর মারইয়াম-পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত (অন্যের) 'ইবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, পবিত্রতা আর মহিমা তাঁরই, (বহু ঊর্ধ্বে তিনি) তারা যাদেরকে (তাঁর) অংশীদার গণ্য করে তা থেকে। করেন?

সূরা তাওবাহ ৯:৩১

মসীহের প্রকৃত অনুসারী কারা

এই অধ্যায়টি কুরআন ও মসীহ (ঈসা আঃ)-কে নিয়ে ছিল। এখন অধ্যায়ের সমাপ্তির আগে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি বর্তমানে আসলে কারা মসীহকে অনুসরণ করছে?

নিশ্চয়ই, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অধিকার কোনো সাধারণ মানুষের নয়; বরং এর উত্তর দেবে কুরআন নিজেই।

কুরআনে মসীহের অনুসারী শিষ্যদের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা মসীহের কাছে অনুরোধ করেছিল যে, তিনি যে সত্য নিয়ে এসেছিলেন, তার প্রমাণ হিসেবে যেনো আল্লাহকে ডাকেন যেন তিনি আসমান থেকে রান্না করা খাবারে ভর্তি একটি দস্তরখান পাঠান।

إِذۡ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ هَلۡ يَسۡتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيۡنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِۖ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

"যখন শিষ্যরা বলেছিল, 'হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান থেকে এক খাবার-ভরা টেবিল (দস্তরখান) নামিয়ে দিতে পারেন?' ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা সত্যিই ঈমানদার হও।'"

সূরা আল-মায়িদাহ,আয়াত ১১২

ঈসা (আঃ) তাদের অনুরোধের জবাবে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করলেন, যেন আসমান থেকে খাদ্যে পরিপূর্ণ এক দস্তরখান নাযিল করেন। একইসঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন যে, এই ঘটনাটি তাঁর বর্তমান অনুসারীদের জন্য যেমন, তেমনি তাঁর শেষ যুগের অনুসারীদের জন্যও একটি 'ঈদ' অর্থাৎ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার উৎসব হিসেবে পালিত হওয়া উচিত।

مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً ٱلرَّٰزِقِينَ

মরিয়ম-পুত্র ঈসা বললেন, 'হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি আসমান থেকে একটি দস্তরখান (খাবার টেবিল) নাযিল করুন যা আমাদের প্রথম প্রজন্ম এবং শেষ প্রজন্ম সকলের জন্য একটি ঈদ (উৎসব দিবস) হবে, আর হবে তোমার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন। আমাদের রিজিক দাও, নিশ্চয়ই তুমি সর্বোত্তম রিজিকদাতা।

সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ১১৪

কুরআন যে নিদর্শনটি উল্লেখ করেছে, যার মাধ্যমে আখিরুযযামানে (শেষ যুগে) ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীদের চিহ্নিত করা যাবে, তা হলো তারা এখনো পর্যন্ত সেই ঘটনার স্মরণে এক বিশেষ উৎসব পালন করে, যা ইতিহাসে পরিচিত হয়েছে "দ্য লাস্ট সাপার"(শেষ নৈশভোজ) নামে। কুরআন মসীহের প্রকৃত অনুসারীদের চেনার জন্য আরও একটি নিদর্শন দিয়েছে, অর্থাৎ, তারা হবে বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতির মানুষ।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ

"এরপর আমি তাদের অনুসরণে আমার আরও রসূলদের প্রেরণ করেছিলাম, এবং মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছিলাম। আমি তাকে দিয়েছিলাম ইনজিল, আর যারা

তাকে অনুসরণ করেছিল তাদের অন্তরে দিয়েছিলাম সহানুভূতি ও দয়া। আর তারা স্বীয় ইচ্ছায় এক ধরনের রাহবানিয়াত (সন্ন্যাস জীবন) প্রবর্তন করেছিল আমি তা তাদের জন্য ফরজ করিনি, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি। তবুও, তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমি তাদের পুরস্কার দিয়েছি; আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসেক (অবাধ্য)।"

সূরা আল-হাদীদ, আয়াত ২৭

অবশেষে, কুরআন ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীদের চেনার জন্য একটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন প্রদান করেছে, যা পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাদের অর্থাৎ, যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন; এবং যখন তারা সেই শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানে উন্নীত হবে, তখন তারা পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই থাকবে।

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বললেন: 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমার রূহ (আত্মা) গ্রহণ করব এবং তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব; আর যারা সত্যকে অস্বীকার করে, তাদের সংস্পর্শ থেকে তোমাকে পবিত্র করব। আর যারা তোমাকে অনুসরণ করে, তাদেরকে যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের ওপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব দেব; এবং কেয়ামত পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকবে। শেষ পর্যন্ত, তোমাদের সকলকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, তখন তোমরা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করতে, সে বিষয়ে আমি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবো।'"

সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৫৫

এভাবে কুরআন ঘোষণা করেছে যে, বিশ্ব ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে এমন এক খ্রিস্টান জাতি দ্বারা, যারা সারা বিশ্বে শাসন করবে। কুরআন আরও বলেছে যে, তারা অহংকারী না হয়ে বরং বিনয়ী ও নম্র হবে। এবং তারা পৃথিবী শাসন করতে পারবে, কারণ আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাদের এমন শক্তি দেবেন, যার ফলে তারা ঈসা

(আঃ)-কে মসীহ হিসেবে প্রত্যাখ্যানকারীদের ইহুদি শাসন প্যাক্স জুডাইকা-ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করবে।

এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে, আমরা পাঠকদের মনে করিয়ে দিচ্ছি যে কুরআন খুব পরিষ্কারভাবে বলেছে: সত্যিকারের খ্রিস্টানদের প্রধান গুণগুলো হলো নম্রতা, মমতা এবং নির্জন ধর্মীয় জীবনযাপন বা সন্ন্যাসবাদের প্রতি টান। এর মধ্যে মঠ (আশ্রম) ও সন্ন্যাসীদের প্রতি ভালোবাসা বোঝানো হয়েছে। সত্যিকারের খ্রিস্টানরা কখনোই আক্রমণকারী হয় না,। তারা এমন অহংকারী জাতিও নয় যারা সবাইকে জোর করে নিজেদের বশে এনে পৃথিবী শাসন করতে চায়।

যেসব খ্রিস্টানরা তাদের সেই নম্রতা ও বিনয়ের পথ থেকে সরে গেছে, তাদের উচিত দ্রুত সেই পথে ফিরে আসা। এখন, আল্লাহ অর্থোডক্স খ্রিস্টান রাশিয়াকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তারা সফলভাবে তাদের প্রতিরোধ করতে পারবে যারা ইহুদি শাসন (Pax Judaica) প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবী শাসন করতে চায়। আর চীন সেই রাশিয়ার সাথে জোট বেঁধেছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, যখন পৃথিবী দেখবে যে এই বিষয়ে কুরআনে যা বলা হয়েছে, তা কত সত্য।

অধ্যায়: ৩

কুরআন ও মসীহের পুনরাগমন

এই বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এটি। কিন্তু এই অধ্যায়ে কুরআন বোঝাতে আমাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়েছে। এই সমস্যা কুরআনের নিজস্ব কোনো কারণে নয়। বরং, কিছু রহস্যময় বাধা সময়ের সাথে সাথে তৈরি হয়েছে, যা কুরআনের আসল অর্থ বুঝতে বাধা দেয় এবং ভুল পথে নিয়ে যায়। এই বাধাগুলো কারা তৈরি করেছে, তা খুঁজে বের করার ভার আমরা পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয়ই বিশ্বাস করে যে, মসীহ ঈসা (আঃ) শেষ সময়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হলো: সত্যিকারের মসীহ ঈসা (আঃ) মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে এসেছিলেন; তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল; কয়েক দিন পর তিনি কবর থেকে উঠেছিলেন; এবং তারপর আল্লাহ তায়ালার কাছে আরোহণ করেছিলেন, যেখান থেকে তিনি একদিন রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

তবে, পশ্চিমা খ্রিস্টানরা এখন ক্রমবর্ধমানভাবে এমন একটি মত গ্রহণ করছে যে, মসীহ রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে নয়, বরং আত্মা রূপে ফিরে আসবেন।

কুরআন এবং হাদীসের ওপর ভিত্তি করে মুসলিমদের বিশ্বাস হলো: মসীহ ঈসা (আঃ) মানুষের রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাকে কেউ কেউ গ্রহণ করেছিল এবং বাকিরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ সেখানে উপস্থিত মানুষদের কাছে এমনটা দেখিয়েছিলেন যে, তাকে যেন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, যদিও আসল ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছিলেন, এবং তিনি একদিন রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

এই অধ্যায়টি কুরআনের এমন সব প্রমাণ তুলে ধরার জন্য লেখা হয়েছে, যা মসীহের অলৌকিক প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করে।

ভারতীয় ইসলামী পণ্ডিত, আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন), মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ১০০টিরও বেশি হাদীস সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করেছেন, যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে ঈসা (আঃ) একদিন পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। যদিও এই অধ্যায়ে মসীহের প্রত্যাবর্তনের প্রমাণ হিসেবে হাদীস তুলে ধরা হয়নি, তবুও একটি হাদীস উল্লেখ করলে কোনো ক্ষতি হবে না:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا

"যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! অচিরেই তোমাদের মধ্যে মারইয়ামের পুত্র (ঈসা) ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে অবতরণ করবেন..."

সহিহ বুখারি

একই ভবিষ্যদ্বাণী আরেকটি হাদীসেও পাওয়া যায়, যদিও সেখানে এর বর্ণনা কিছুটা ভিন্ন ভাষায় এসেছে।

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا وَإِمَامًا

"কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মারইয়ামের পুত্র ঈসা ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইমাম (নেতা) হিসেবে (পৃথিবীতে) অবতরণ করেন।"

সুনান ইবনে মাজাহ

এখন আসুন, আমরা কুরআনের দিকে ফিরে যাই যাতে মসীহের অলৌকিকভাবে ফিরে আসার পক্ষে প্রমাণ খুঁজে বের করতে পারি।

ক্রুশবিদ্ধকরণ ও মসীহের প্রত্যাবর্তন

যদি কেউ ২ হাজার বছরেরও বেশি আগে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এমন দীর্ঘ সময় পেরিয়ে অলৌকিকভাবে আবার ফিরে আসেন এবং নিজের পরিচয় নিশ্চিত করে মানুষের মাঝে হেঁটে বেড়ান ও কথা বলেন, তবে তা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে অসাধারণ ও বিরল ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে। মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয়ই বিশ্বাস

করে যে, ঈসা (আঃ) যখন এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, তখন ঠিক এমনই একটি ঘটনা ঘটবে।

যেহেতু কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে সবকিছুর ব্যাখ্যা করার জন্য, তাই মসীহ (ঈসা আঃ)-এর এই অলৌকিক পুনরাগমনের ঘটনাটিও এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বা ব্যাখ্যা করা উচিত। অর্থাৎ, কুরআন স্পষ্টভাবে নিজেকে "সমস্ত বিষয়ের বর্ণনাকারী ও ব্যাখ্যাকারী" হিসেবে পরিচয় দেয়; অতএব এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ...

..এবং আমি তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি, যা প্রতিটি জিনিসের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, পথনির্দেশ, রহমত এবং সুসংবাদ..."

সূরা আন-নাহল ১৬:৮৯

প্রিয় পাঠক, আমরা যখন এই অধ্যায়ে কুরআন থেকে প্রমাণ দেব যে, মসীহ ঈসা (আঃ) আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, তখন কিছু ভুল ধারণা দূর করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ভুল ধারণা হলো মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত একটি মিথ্যা বিশ্বাস, যা খুব জনপ্রিয়। এই বিশ্বাস বলে যে, আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর বদলে অন্য একজন মানুষকে তার মতো করে দিয়েছিলেন এবং সেই নির্দোষ লোকটাকেই ক্রুশে ঝোলানো হয়েছিল, ঈসাকে নয়। এই ধারণাটা শুধু মিথ্যা আর ভিত্তিহীনই নয়, এটা খুবই বিপজ্জনকও।

প্রিয় পাঠক, এই অধ্যায়ে আমরা যতই অগ্রসর হবো, ততই আপনারা উপলব্ধি করবেন যে, এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুরআনের আলোকে আমাদের আরও কয়েকটি রহস্যময় ও জটিল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। অর্থাৎ, মসীহ ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের কুরআনিক ব্যাখ্যা উন্মোচনের পথে এমন কিছু বিভ্রান্তিকর ধারণা ও জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে, যা আমাদেরকে অত্যন্ত সরল ও সাবলীলভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

কুরআন থেকে প্রথম প্রমাণ যে ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন

প্রত্যেক আত্মাকেই 'মউত' (মৃত্যু) আস্বাদন করতে হবে। ঈসা (আঃ) মারা যাননি, বরং তাঁকে আল্লাহর কাছে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাই, অন্যদের মতো তাঁকেও মৃত্যু আস্বাদন করার জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা জোরালোভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। যদিও, আল্লাহর ইচ্ছায় এমনটা দেখানো হয়েছিল যে, তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে:

وَّ قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا

এবং তাদের এ কথার কারণে যে, 'আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি'। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।

সূরা আন-নিসা আয়াত ১৫৭

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

বরং আল্লাহ তাঁর কাছে তাকে তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৫৮

কুরআনের উপরের দুটি আয়াতে স্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে:

1. ইহুদিরা অহংকার করে বলেছিল, তারা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে; কিন্তু বাস্তবে তারা তাঁকে হত্যা করেনি।

2. তারা গর্ব করে দাবি করেছিল, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধও করা হয়নি।

3. বরং, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের কাছে এমনভাবে ঘটনাটি প্রতীয়মান করে তুলেছিলেন যেন তাঁরা মনে করে যে তাঁরা ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেছে অথচ বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আল্লাহ কীভাবে ইহুদিদেরকে এটা বিশ্বাস করালেন যে, তারা ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে হত্যা করেছে,
যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা তা করতে পারেনি? যেহেতু কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে যে, এটি সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী (সূরা আন-নাহল, ১৬:৮৯), সেহেতু এই প্রশ্নের উত্তর অনুমানের উপর ভিত্তি করে দেওয়া ঠিক হবে না। বরং, কুরআনকেই এই রহস্য উন্মোচন করতে হবে যে, আল্লাহ কীভাবে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন, যেখানে ইহুদিদের মনে হলো তারা ঈসাকে ক্রুশে হত্যা করেছে, যদিও আসল ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই বিষয়ে আমরা কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের কেবল ব্যাখ্যাই করব না, বরং তা আপনাদের সামনে সহজবোধ্য ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করব।

কুরআনের উপরের আয়াতগুলি (৪:১৫৭–১৫৮)-এর পাশাপাশি কুরআনের আরও দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে, যা ক্রুশবিদ্ধকরণের সময় যা ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম অনুচ্ছেদ:

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বললেন: 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমার রূহ (আত্মা) গ্রহণ করব এবং তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব; আর যারা সত্যকে অস্বীকার করে, তাদের সংস্পর্শ থেকে তোমাকে পবিত্র করব। আর যারা তোমাকে অনুসরণ করে, তাদেরকে যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের ওপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব দেব; এবং কেয়ামত পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকবে। শেষ পর্যন্ত, তোমাদের সকলকে আমার

কাছেই ফিরে আসতে হবে, তখন তোমরা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করতে, সে বিষয়ে আমি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবো।'"

সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৫৫

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

আর আল্লাহ যখন বলবেন, 'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষদেরকে বলেছিলে যে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর?' সে বলবে, 'আপনি পবিত্র মহান, যার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য সম্ভব নয়। যদি আমি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না; নিশ্চয় আপনি গায়েবী বিষয়সমূহে সর্বজ্ঞাত'।

সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত ১১৬

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِیْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبَّكُمْ ۚ وَ كُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیْبَ عَلَیْهِمْ ؕ وَ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ

আমি তাদেরকে কেবল তাই বলেছি, যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর। আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী। আর আপনি সব কিছুর উপর সাক্ষী।

সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত ১১৭

কুরআনের উপরের দুটি অংশ থেকে আমরা ক্রুশবিদ্ধ করার ঘটনা সম্পর্কে আরও দুটি জিনিস জানতে পারি:

৪. আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আঃ)-এর আত্মা ক্রুশবিদ্ধকরণের সময় গ্রহণ করেছিলেন।

৫. আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আঃ)-কে নিজের দিকে তুলে নিয়েছেন।

যখন কুরআন ঘোষণা করে, "আমি তোমাকে মৃত্যু (ওফাত) আস্বাদন করাব" (নীচে):

إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ওফাত (মৃত্যুর স্বাদ) আস্বাদন করাব এবং তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব ।"

এখানে 'ওয়াফাত' শব্দটির একটিই মাত্র সুস্পষ্ট অর্থ হতে পারে, আর তা হলো: 'আমি তোমার প্রাণ বা রূহ কবজ করব!' যারা আরবী মূল পাঠকে পাশ কাটিয়ে এর ভিন্নতর ব্যাখ্যা বা অনুবাদ করার অপচেষ্টা করে, তারা এক অর্থে কুরআনের বাণীর সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা কেবল আয়াতের মূল অর্থই নয়, বরং এর সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপটকেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপেক্ষা করে, যাতে তাদের সেই মনগড়া 'বদল-তত্ত্ব'-কে প্রতিষ্ঠা করা যায়, যেখানে বলা হয় ঈসার পরিবর্তে অন্য কাউকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এই ধরনের কাজ আল্লাহর বাণীর প্রতি চরম অসম্মানেরই প্রকাশ, আর এর মাধ্যমে আল্লাহকেই অসম্মান করা হয়।

কিছু লোক 'ওয়ফাত' শব্দটির অর্থ করে: 'হে ঈসা, আমি তোমাকে (আমার কাছে) তুলে নেব এবং উঠিয়ে নেব!' কিন্তু এভাবে অনুবাদ করার ফলে তারা কুরআনের অনেক আয়াতে থাকা 'ওয়ফাত' (যার মানে আল্লাহ যখন কারো প্রাণ নেন) এবং 'মউত' (যার মানে আল্লাহ যখন প্রাণ নেন এবং সেটা আর ফিরিয়ে দেন না, ফলে মানুষের মৃত্যু হয়) এই দুটির মধ্যে যে পরিষ্কার যোগসূত্র আছে, তা মানতে চায় না।

পাঠকদের অবশ্যই খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে যে, যখনই আল্লাহ তায়ালা কোনো রূহ (আত্মা) কব্জা করেন, তখনই সাধারণত তার ফল হয় 'মউত' বা মৃত্যু। পাঠকগণ যেন কুরআনের নিম্নলিখিত তিনটি আয়াত গভীরভাবে ভেবে দেখেন, যেখানে 'ওফাত' (অর্থাৎ, রূহ কব্জা করা) এবং 'মউত' (অর্থাৎ, মৃত্যু) শব্দ দুটি ধারাবাহিকভাবে একসাথে ব্যবহার করা হয়েছে:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا

"আল্লাহ রূহসমূহকে (ওয়ফাত) মৃত্যুর সময় কব্জা করেন..."

সূরা আয-যুমার ৩৯:৪২

حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا...

"...যতক্ষণ না [ওয়ফাত] তাদের মৃত্যু ঘটায়, অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো পথ খুলে দেন।"

সূরা আন-নিসা ৪:১৫

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

তিনি তাঁর বান্দাহ্দের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল, আর তিনি তোমাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করেন। অতঃপর তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আমার প্রেরিতগণ (ফেরেশতারা) তার মৃত্যু ঘটায়। নিজেদের কর্তব্য পালনে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না।

সূরা আল-আন'আম, ৬:৬১

এখন আমরা জানতে পারলাম কেন ইহুদিরা ভেবেছিল যে তারা ঈসা (আঃ)-কে মেরে ফেলেছে এবং ক্রুশবিদ্ধ করেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাদের এমনটা ভাবা যুক্তিযুক্ত ছিল, কারণ ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় তাদের চোখের সামনেই আল্লাহ ঈসার রূহ (আত্মা) নিয়ে নিয়েছিলেন। সহজ কথায়, যখন ঈসা ক্রুশে ছিলেন, তখন তারা নিজ চোখে দেখেছিল যে তিনি 'শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন' (মৃত্যুর একটি প্রচলিত ধারণা)।

কেউ কেউ উপরের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে যুক্তি দেন যে, ঈসা (আঃ)-কে কখনোই ক্রুশে উঠানো হয়নি। বরং তারা তাদের মনগড়া 'বদল তত্ত্ব' প্রচার করে, যে অন্য একজন ব্যক্তিকে ঈসার মতো রূপ দিয়ে ক্রুশে উঠানো হয়েছিল, এবং সেই নির্দোষ ব্যক্তিই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন ঈসা (আঃ) নন।

এখন যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা বাকি রইল, তা হলো ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর যে চিত্র মানুষের সামনে ফুটে উঠেছিল (যখন আল্লাহ তাঁর রূহ কব্জা করেছিলেন), তা প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে কীভাবে ভিন্ন ছিল। প্রত্যেক ইহুদি এবং প্রত্যেক খ্রিস্টান এই বিষয়ে

কুরআন কী বলে, তা জানতে খুবই আগ্রহী হবে। তবে, কুরআনের মাধ্যমে আসল ও নকলের পার্থক্য ব্যাখ্যা করার আগে, আসুন প্রথমে সেই মনগড়া 'বদল তত্ত্ব'-এর জবাব দিই।

একটি প্রতিবন্ধকতা:

এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, অনেক মুসলিম, এমনকি বড় বড় আলেমরাও, ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'বদল তত্ত্ব' নামক একটি ভুল ধারণা মেনে নিয়েছেন। এই ভুল ধারণা অনুযায়ী, আল্লাহ অন্য একজন মানুষকে ঈসা (আঃ)-এর মতো করে দিয়েছিলেন, আর সেই নির্দোষ মানুষটিকেই (যে কখনোই নিজেকে মসীহ দাবি করেনি) ক্রুশে ঝোলানো হয়েছিল।

এই বদল তত্ত্ব অনুযায়ী আল্লাহ সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়, যদিও তার সমর্থনে একটিও প্রমাণ নেই:

- আল্লাহ এমন একজন মানুষকে ঈসা (আঃ)-এর চেহারার মতো বানিয়ে দিলেন। আর ঈসার বদলে সেই লোকটাকেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।
- আল্লাহ একজন নির্দোষ মানুষকে, যে কখনোই নিজেকে মসীহ বলেনি, তাকে মসীহ দাবি করার জন্য ক্রুশে ঝোলানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমরা ‘বদল তত্ত্ব’ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করি, কারণ এর কোনো প্রমাণ কুরআনে নেই। যারা কুরআন থেকে এই মতের পক্ষে যুক্তি খোঁজেন, তারা বলেন যেহেতু কুরআনে বলা হয়েছে যে ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করা হয়নি বা ক্রুশে ঝুলানো হয়নি, তাই তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়াই সম্ভব নয়। কিন্তু এই কথা ধরে রাখতে হলে, তাদের বাধ্য হয়ে এই ‘বদল তত্ত্ব’-কেই মানতে হয় অর্থাৎ, ঈসা (আঃ)-এর মতো দেখতে অন্য কাউকে তাঁর জায়গায় ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল।

যদি জেরুজালেমে সত্যিই এমন কেউ থাকতেন, যিনি চেহারায় ঈসা (আঃ)-এর মতো দেখতে ছিলেন, তাহলে নিঃসন্দেহে সেই খবর শহরজুড়ে বরং সমগ্র অঞ্চলে প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে পড়ত। তাহলে প্রশ্ন হলো, কীভাবে সম্ভব হলো এমন এক ব্যক্তি রহস্যজনকভাবে হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া, যাকে কেউ আগে কখনো দেখেনি আর সে-ই নাকি ঈসার বদলে ক্রুশে উঠল?

সে লোকটি কোথা থেকে এলো, আকাশ থেকে কি নেমে এসেছিল?

‘বদল তত্ত্ব’-এর অনুসারীরা নিজেদের যুক্তিকে আরও দুর্বল করে ফেলে যখন তারা দাবি করে যে, ক্রুশে উঠানোর ঠিক পূর্বমুহূর্তে আল্লাহ অন্য এক ব্যক্তিকে ঈসা (আঃ)-এর মতো করে দিয়েছিলেন।

ঈসা (আঃ)-এর মতো দেখতে অন্য কারো উপস্থিতি থাকার এই বিশ্বাস সম্ভবত অত্যন্ত বোকামি করে ‘বারনাবাসের সুসমাচার’-এর একটি বিকৃত ইতালীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বইটির ইতিহাস ১৬শ ও ১৭শ শতকের। সেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা জুডাসকে (যিশুর একজন শিষ্য) ঈসার মতো করে দিয়েছিলেন।

,এই 'বদল তত্ত্ব' আল্লাহর ওপর একটা অন্যায় কাজ চাপিয়ে দেয়। তাই যারা জোর করে এই ব্যাখ্যাকে আঁকড়ে ধরে আছে, তাদের উচিত কিয়ামতের দিনে নিজেদের বাঁচানোর জন্য তৈরি থাকা। এই 'বদল তত্ত্ব'কে অনেক মুসলিম এমনকি অনেক আলেমও কোনো প্রশ্ন না করেই মেনে নিয়েছেন। অথচ এটা কুরআনে বলা আল্লাহর সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের নিয়মের বিরুদ্ধে যায়। কুরআন পরিষ্কার বলেছে যে, কেউই অন্যের পাপের বোঝা বইবে না:

قُلۡ اَغَيۡرَ اللّٰهِ اَبۡغِىۡ رَبًّا وَّ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَىۡءٍ ؕ وَ لَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ اِلَّا عَلَيۡهَا ۚ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمۡ مَّرۡجِعُكُمۡ فَيُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ فِيۡهِ تَخۡتَلِفُوۡنَ

বল, ‘আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন রব অনুসন্ধান করব’ অথচ তিনি সব কিছুর রব’? আর প্রতিটি ব্যক্তি যা অর্জন করে, তা শুধু তারই উপর বর্তায় আর কোন ভারবহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের রবের নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে সেই সংবাদ দেবেন, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে।

(সূরা আল-আন‘আম, ৬:১৬৪। এছাড়াও দেখুন ১৭:১৫, ৩৫:১৮, ৩৯:৭ এবং ৫৩:৩৮।

এটি আল্লাহ তায়ালাকে এমন এক অন্যায় কাজের সঙ্গে যুক্ত করেছে, কারণ বলা হয়েছে যে, এক নিরপরাধ মানুষকে এমন একটি কারণে জীবন দিতে হলো, যা সে কখনো করেনি। নিঃসন্দেহে অন্যায় হবে যদি কাউকে ক্রুশে ঝোলানো হয় মসীহ

হওয়ার দাবি করার জন্য, অথচ সে কখনো এমন দাবি করেনি। আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি কখনো কারো সঙ্গে অন্যায় করেন না।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا

নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলম করেন না। আর যদি সেটি ভাল কাজ হয়, তিনি তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান প্রদান করেন।

সূরা আন-নিসা, ৪:৪০

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَ مَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

আমার কথার রদ বদল হয়না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করিনা।

সূরা ক্বাফ ৫০:২৯

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّ لٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুলম করেননা, বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে।

সূরা ইউনুস ১০:৪৪

কিয়ামতের দিনে, যারা আল্লাহর এই কথিত অন্যায়ের ঘটনা ঘটেছে বলে ঘোষণা করবে, আল্লাহ তাদের কাছে তখন প্রমাণ চাইবেন যে, তিনি এমন কাজ করেছেন কিনা, যেমনটা তারা তাঁর সম্পর্কে
বলেছে অর্থাৎ, তিনি ঈসা (আঃ)-এর মতো দেখতে অন্য কাউকে তৈরি করেছেন এবং ঈসার বদলে সেই লোকটাকেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে।

যখন তারা তাদের প্রমাণ হিসেবে মনগড়া অনুমান ও ভিত্তিহীন ধারণা পেশ করবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে তারা ভুল করেছে এবং আল্লাহর সম্পর্কে একটি মিথ্যা ও অন্যায় কথা বলে তারা এক জঘন্য পাপ করেছে, অর্থাৎ তারা তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে।

এখন যেহেতু আমরা ‘বদল তত্ত্ব’ নামে পরিচিত মিথ্যা ধারণাটি স্পষ্টভাবে খণ্ডন করতে পেরেছি, তাই আমরা আবার সরাসরি কুরআনের দিকেই ফিরে যেতে পারি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা যখন মসীহের রূহ (আত্মা) কবজ করেছিলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল, তা উন্মোচন করা। এর মাধ্যমেই আমরা এটিও অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে পারব যে, কুরআন কখনোই ঈসা (আঃ)-কে মৃত বলে ঘোষণা করেনি; এমন কোনো দাবি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।

ঈসা (আঃ) সেই ধরনের 'মউত' (মৃত্যু) বরণ করেননি, যেখানে আল্লাহ কারো প্রাণ নেন এবং তা আর ফেরত দেন না।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কুরআন দুটি জায়গায় খুব পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে যে, ক্রুশবিদ্ধ করার সময় আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আঃ)-এর রূহ কব্জা করেছিলেন:

...إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ

"স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বললেন: 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমার রূহ (আত্মা) কব্জা করব...'"

সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৫৫

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"“... কিন্তু যখন থেকে আপনি আমার রূহ (আত্মা) কব্জা করেছেন (নিয়ে নিয়েছেন), তখন থেকে আপনিই তাদের একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন: আপনিই সবকিছুর সাক্ষী।” (মুহাম্মদ আবদেল হালিমের অনুবাদ)"

সূরা আল-মায়িদাহ আয়াত ১১৭

যদি আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর রূহ নিতেন এবং ধরে রাখতেন, তাহলে এর অর্থ হত যে তিনি মারা গেছেন। এতে মনে হতো ইহুদিরা সত্যিই তাকে হত্যা ও ক্রুশে ঝুলাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু কুরআন স্পষ্টভাবে বলে যে, এমন কিছু ঘটেনি। বরং কুরআন আমাদের অবাক করার মতো তথ্য জানিয়েছে, যা আমাদের এখন বুঝতে সাহায্য করে যে আসলে কি ঘটেছিল।

কুরআন আমাদের জানায় যে, আল্লাহ যে রূহ (আত্মা) কব্জা করেন, তা তিনি ফিরিয়েও দিতে পারেন। যখন তিনি একটি রূহ কব্জা করেন (ওফাত ঘটান) এবং তারপর তা ফিরিয়ে দেন, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় যে সেই ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে মারা যায়নি!

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"আল্লাহই রূহসমূহকে তাদের মৃত্যুর সময় কব্জা করেন এবং যাদের মৃত্যু আসেনি, তাদের রূহ নিদ্রার সময় (কব্জা করেন)। অতঃপর যাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করেছেন, তাদের রূহ রেখে দেন এবং অপর রূহগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (শরীরে) ফিরিয়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

সূরা আয-যুমার ৩৯:৪২

পাঠকগণ হয়তো একটি কাল্পনিক ঘটনার সাথে পরিচিত হতে পারেন, যা আমরা এখন বর্ণনা করতে যাচ্ছি:

"একদা এক মহিলা গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন, আর তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর পরিবার অ্যাম্বুলেন্সে ফোন দিল, যা দ্রুত চলে এলো। অ্যাম্বুলেন্সের সাথে আসা জরুরি স্বাস্থ্যকর্মীরা (প্যারামেডিকস) তাঁকে পরীক্ষা করে জীবনের কোনো চিহ্ন পেলেন না। তাঁর নিথর দেহ হাসপাতালে নেওয়া হলো, যেখানে আবারও পরীক্ষা করে তাঁকে 'হাসপাতালে আনার পথেই মৃত' ঘোষণা করা হলো। এরপর তাঁর দেহ মর্গে (মরদেহ রাখার হিমঘর) নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে একজন ডাক্তার তাঁর মৃত্যুর কারণ জানতে ময়নাতদন্ত করার জন্য এলেন। তাঁর নিথর, নগ্ন দেহটা একটা অপারেশনের টেবিলে রাখা ছিল, আর ডাক্তার যখন তাঁকে কাটতে ছুরি তুলবেন, ঠিক তখনই মহিলাটি চোখ খুললেন। তিনি নিজেকে নগ্ন অবস্থায় দেখলেন, আর দেখলেন যে একজন লোক তাঁর সামনে ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, যা তাঁর ওপর ব্যবহার করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে উঠলেন। ডাক্তার এমন অটল বিশ্বাস নিয়ে জবাব দিলেন, যেমনটা বিজ্ঞান মাঝে মাঝে প্রকাশ করা সত্যকে চ্যালেঞ্জ করার সময় বলে থাকে: "ম্যাডাম, আপনি মৃত!"

উপরের কাল্পনিক ঘটনাটির ব্যাখ্যা কুরআন আমাদের দেয়। এটি এমন একটি ব্যাখ্যা যা আধুনিক বিজ্ঞানের সীমার বাইরে। আল্লাহ তায়ালা হৃদরোগের সময় তাঁর রূহ (আত্মা) কব্জা করেছিলেন, তাই কোনো জীবনের চিহ্ন দেখা যায়নি। এরপর আল্লাহ সেই রূহ আবার ফিরিয়ে দিলেন, সৌভাগ্যক্রমে ঠিক তখনই যখন ডাক্তার তাঁকে কাটতে যাচ্ছিলেন। ফলে তিনি মারা যাননি, যদিও আল্লাহ তাঁর রূহ নেন। সেই নারী একটি ওয়ফাতের অভিজ্ঞতা পার করলেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রূহ গ্রহণ করলেন এবং পরে ফিরিয়ে দিলেন।

ঈসা (আঃ) এমন এক 'ওয়ফাত' আস্বাদন করেছিলেন, যেখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রূহ (আত্মা) কব্জা করেছিলেন এবং তারপর তা আবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

যখন ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, তখন কী ঘটেছিল এখন তা স্পষ্ট।
আল্লাহ তায়ালা ক্রুশে থাকা অবস্থায়ই তাঁর রূহ (প্রাণ) কব্জা করেছিলেন। তাই উপস্থিত লোকেরা তাঁকে বাস্তবিক অর্থেই ‘শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে’ দেখেছিল। অর্থাৎ, তাঁদের কাছে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এমনটাই স্পষ্ট মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে, যখন আশেপাশে কেউ ছিল না, তখন আল্লাহ আবার তাঁর রূহ ফিরিয়ে দেন, এবং তখন ঈসা (আ.) পুনরায় জেগে ওঠেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নেন।

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"বরং আল্লাহ তাকে (ঈসা আঃ-কে) নিজের দিকে তুলে নিয়েছেন। আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

সূরা আন-নিসা ৪:১৫৮

এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য হলো, তাঁকে (ঈসা আঃ) হত্যা ও করা হয়নি এবং ক্রুশবিদ্ধও করা হয়নি, কিন্তু যারা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল, তাদের চোখে কেবলই ধোঁকা লেগেছিল; অর্থাৎ, তাদেরকে যা দেখানো হয়েছিল, তা সত্যি ছিল না।

কুরআনের আলোকে মৃত্যুর সংজ্ঞা হলো, আল্লাহ যখন কোনো আত্মা (রূহ) গ্রহণ করেন এবং তা আর ফেরত দেন না, তাকেই ‘মউত’ বা মৃত্যু বলা হয়। আল্লাহ তাঁর (ঈসার)

আত্মা গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তা আবার ফিরিয়েও দিয়েছিলেন। একারণে ঈসা (আঃ) কখনো 'মউত' বা প্রকৃত মৃত্যুর সম্মুখীন হননি।

যেহেতু মসীহের (ঈসা আঃ) আত্মা তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করার পর আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং একারণে তিনি 'মউত' বা মৃত্যুর সম্মুখীন হননি, এবং যেহেতু তাঁকে স্বয়ং আল্লাহর নিকট তুলে নেওয়া হয়েছে, সেহেতু এর তাৎপর্য হলো মসীহকে অবশ্যই একদিন এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন (অর্থাৎ 'মউত'-এর স্বাদ গ্রহণ করবেন) এবং সবশেষে মানবজাতির অন্য সকলের সাথে তাঁকেও পুনরায় জীবিত করা হবে। এর কারণ হলো, কুরআন আমাদেরকে জানিয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মাকেই 'মউত' বা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

"প্রতিটি প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"

সূরা আল-ইমরান আয়াত ১৮৫

সবশেষে, কুরআন আরও একটি চূড়ান্ত প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা ক্রুশের সময় ঈসা (আঃ)-এর সাথে যে অলৌকিক কাজটি করেছিলেন, ঈসা (আঃ) নিজেও—আল্লাহরই হুকুমে—ঠিক সেই একই কাজ অন্যদের জন্য করতেন। সোজা কথায়: আল্লাহ যখন কারো আত্মা কবজ করে নিতেন, ঈসা (আঃ) তখন আল্লাহর অনুমতিতে সেই আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে আনতেন:

... وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ...

"... এবং আমি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করি ..."

সুরা আলে ইমরান ৩:৪৯

কুরআন আমাদেরকে জানিয়েছে যে, আল্লাহ যখন কোনো আত্মা গ্রহণ করেন, তারপর কেবল দুটি সম্ভাবনাই থাকে: হয় তিনি সেটিকে (নিজের কাছে) রেখে দেন, অথবা তিনি তা ফিরিয়ে দেন। এর বাইরে তৃতীয় কোনো সম্ভাবনা নেই।

অতএব, ঈসা (আঃ) কর্তৃক মৃতকে জীবনদানের এই অলৌকিক ঘটনাটির একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা এই যে, প্রথমে আল্লাহ তা'আলা সেই আত্মাটি কবজ করতেন এবং অতঃপর ঈসার মাধ্যমে সেটিকে (তার দেহে) পুনঃস্থাপনের অনুমতি প্রদান করতেন। এর ব্যতিরেকে অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে না।

এখন আমরা উপসংহারে আসতে পারি যেহেতু ঈসা (আঃ) এখনও মৃত্যুবরণ করেননি, অথচ প্রত্যেক আত্মাকেই একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, তাই অনিবার্যভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, তাঁকে অবশ্যই আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। এরপর, অন্যান্য সকল মানুষের মতো তিনিও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবেন এটাই আল্লাহর নির্ধারিত সুন্নাহ, যেটি কখনো পরিবর্তিত হয় না।

আমাদের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে এমন কিছু বিশ্বাসী লোক ছিলেন (যারা ঈসা আঃ-কে মসীহ মানতেন), যারা তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার কিছুদিন পরেই এই সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তিনি আসলে তখনও জীবিত। এর কারণ হলো, অনেকেই তাঁকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত অবস্থায় দেখেছেন বলে জোরালো খবর ছড়িয়ে পড়েছিল।
তবে তারা এটা জানতেন না যে, ক্রুশে ঘটনার সময় তারা যে মৃত্যুকে দেখেছিল, তা আসলে কোনো সাধারণ বা চিরস্থায়ী মৃত্যু ছিল না যে মৃত্যুতে আত্মা একবার দেহ ছেড়ে গেলে আর ফেরে না।
বরং যা ঘটেছিল তা হলো, আল্লাহ সাময়িকভাবে তাঁর আত্মা গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে তা আবার ফিরিয়েও দিয়েছিলেন। আর এরপরই আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নেন।
তাঁর আত্মা যখন দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হলো এবং তিনি জীবন ফিরে পেলেন ঠিক সেই সময়েই, অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে তাঁকে তুলে নেওয়ার আগ মুহূর্তে তাঁর কিছু সঙ্গী তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন।
এই বইটিতে তাঁর কতজন অনুসারী তাঁকে দেখেছিলেন, সেই সংখ্যাটি খুঁজে বের করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু যা পরিষ্কার তা হলো, তাঁকে যে দেখা গিয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

এই লেখক ধৈর্য ধরে সেই বিশেষ দিনের অপেক্ষায় আছেন, যেদিন ঈসা (আঃ) পুনরায় ফিরে আসবেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, সেদিন স্বয়ং মসীহ এসে নিশ্চিত করবেন যে, কুরআনের

(উপরে উল্লেখিত) এই ব্যাখ্যাটি সঠিক ছিল; এবং এর বিপরীতে, অন্য কাউকে তাঁর অনুরূপ বানিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করার যে ‘বিকল্প তত্ত্ব’ প্রচলিত আছে, তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন!

কুরআন থেকে দ্বিতীয় প্রমাণ যে ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন

ঈসা (আঃ) যখন পুনরায় ফিরে আসবেন, তখন তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে, তাঁকে মসীহ হিসেবে বিশ্বাস করা ছাড়া ইহুদিদের আর কোনো উপায় থাকবে না।

ঈসা (আঃ) যে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবেন, কুরআনের আলোকে তা বোঝানোর জন্য আমরা আলোচনা শুরু করেছি সূরা নিসার (৪:১৫৭-৫৮) ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি দিয়ে। এই ঘটনা থেকেই নিচের বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়:

১. তারা (ইহুদিরা) দাবি করত যে, তারা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

২. তারা দাবি করত যে, তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছে কিন্তু বাস্তবে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি।

৩. বরং আল্লাহ তায়ালা তাদের চোখে এমনভাবে দেখিয়েছিলেন যেন তারা মনে করেছিল যে তাঁরা ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ঈসাকে যে ক্রুশে চড়ানো হয়েছে, এমনটা দেখানোর পেছনে একটি ঐশ্বরিক পরিকল্পনা ছিল। এর ফলেই, সেখানে উপস্থিত সকল ইহুদি এবং যারা পরে ঘটনাটি সম্পর্কে জেনেছিল, তারা সবাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিল যে ঈসা (আঃ)কে আসলেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। তারা তাঁকে মসীহ হিসেবে মানুক বা না মানুক, তাতে কিছুই যায় আসে না সকলেই এটা বিশ্বাস করত যে, তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছে!

এরপর কুরআন সেই পুরনো চিত্রটিকেই আবার নিশ্চিত করে, যা ক্রুশের ঘটনার আগেও স্পষ্ট ছিল এবং পরেও স্পষ্ট ছিল। চিত্রটি হলো: বনী ইসরাঈলের একদল ঈসা (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে বিশ্বাস করত এবং (তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরও) সেই বিশ্বাসের ওপরই অটল ছিল।

অন্যদিকে, বাকিরা এই ক্রুশের ঘটনাকে একটি সুযোগ হিসেবে নেয় এবং আনন্দের সাথে তাঁর মসীহ হওয়ার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হয়ে যায়:

... فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ...

"... অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং অন্য একদল কুফরী করল (অস্বীকার করল) ..."

সূরা আস-সফ, আয়াত ১৪

অতঃপর কুরআন বনী ইসরাঈলের সেই অংশকে, যারা তাঁকে মসীহ হিসেবে গ্রহণ করেছিল, 'আন-নাসারা' বা খ্রিস্টান নামে আখ্যায়িত করেছে। অন্যদিকে, যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাঁকে হত্যা করার দম্ভ করত, তাদের নামকরণ করা হয়েছে 'আল-ইয়াহুদ' বা ইহুদি। মসীহকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাঁকে হত্যা করার যে দম্ভ ইহুদিরা করেছিল, তা এক যুগান্তকারী ঐশ্বরিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়, যা ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে ইহুদিদের জন্য এক ভয়াবহ পরিণামের ইঙ্গিত বহন করে।
আল্লাহ এটা সুস্পষ্ট করে দেন যে, বনী ইসরাঈল জাতি চিরতরে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং তাদের পুনরায় একত্রিত হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। এর জবাবে তিনি 'বনী ইসরাঈল' নামটি ব্যবহার করা বন্ধ করে দেন এবং এর বদলে 'আহলে কিতাব' বা 'আসমানী কিতাবের অনুসারী' নামটি চালু করেন। এভাবেই বনী ইসরাঈলের অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। এরপর থেকে বনী ইসরাঈলের উভয় দলকেই অর্থাৎ যারা ঈসাকে মসীহ মেনে 'নাসারা' বা খ্রিস্টান হয়েছিল, এবং যারা তাঁকে অস্বীকার করে 'ইয়াহুদ' বা ইহুদি হয়েছিল সবাইকে কুরআনে 'আহলে কিতাব' নামে ডাকা শুরু হয়।

এরপর থেকে কুরআনে আর কখনও 'বনী ইসরাঈল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি আর এটাই ছিল এক অত্যন্ত অশুভ ভয়ংকর ঐশ্বরিক ইঙ্গিত।

বনী ইসরাঈল' নামটি কেন বাতিল করা হলো, তার কারণটিও স্পষ্ট হয়ে যায় সূরা নিসার পরের একটি আয়াত থেকে। সেই আয়াতে এক ভয়ংকর ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এটি হলো ইতিহাসের শেষভাগে অপেক্ষারত সেই পরিণতির কথা, যা বনী ইসরাঈলের সেই ইহুদি অংশের জন্য নির্ধারিত যারা ঈসা (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে মানেনি এবং তাঁকে হত্যা করেছে বলে গর্ব করত।

ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের দ্বিতীয় প্রমাণটিও কুরআনেই নিহিত রয়েছে সেই নাম পরিবর্তনের ঘটনায় এবং এক অশুভ-তাৎপর্যপূর্ণ ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণীতে। আর ঠিক এই

ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেই আমরা কুরআনে ঈসা (আঃ)-এর একদিন ফিরে আসার সুস্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাই। সেই ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণীটি নিম্নরূপ:

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

"তাদের মধ্যে (অর্থাৎ, যারা ঈসাকে মসীহ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিল) এমন একজনও অবশিষ্ট থাকবে না, যে তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁকে মসীহ হিসেবে মেনে নেবে না এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না; এবং শেষ বিচার দিবসে তিনি স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।"

সূরা আন-নিসা ৪:১৫৯

ইহুদীদের জন্য যে ভাগ্যটি অপেক্ষা করছিল তা হলো ইতিহাসের শেষ সময়ে, ঈসার মৃত্যুর আগেই, তাদের সকলকেই তাঁকে মসীহ হিসেবে মেনে নিতে হবে। কিন্তু তারা তাঁকে মসীহ হিসেবে বিশ্বাস করার পরও, কিয়ামতের দিন ঈসা (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন।
উপরের আয়াতে আল্লাহ যখন বললেন যে, 'তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাদের তাঁকে বিশ্বাস করতেই হবে' তখন তিনি কাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেছিলেন?

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটির একটিই মাত্র সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল এবং প্রাসঙ্গিকভাবে নির্ভুল ব্যাখ্যা সম্ভব, আর তা হলো ইতিহাস একদিন নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। আর যখন তা ঘটবে, তখন বিশ্ববাসী ফেরাউনের মৃত্যুর মতোই আরও একবার এক যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী হবে।
ফেরাউন ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে, অর্থাৎ তার মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে, বনী ইসরাঈলের প্রভুর উপর ঈমান এনেছিল। আর (একইভাবে) ইহুদিদেরও তাদের সকলের মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে ঈসাকে মসীহ হিসেবে বিশ্বাস করার ঘোষণা দিতে বাধ্য হবে। তবে এই দুটি ঘটনার মধ্যে পার্থক্য হলো প্রথম ঘটনাটি ছিল ফেরাউন নামক একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, আর এই ঘটনাটি হবে একটি সমগ্র জাতিকে ঘিরে অর্থাৎ,ঈসাকে মসীহ হিসেবে প্রত্যাখ্যানকারী ইহুদিদের সকলকেই,।
মূলত ঠিক এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ ফেরাউনের দেহটিকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি তা করেছিলেন, যেন এই সংরক্ষিত দেহটি তার পরবর্তী এক জাতির জন্য একটি জীবন্ত 'নিদর্শন' হয়ে থাকে।

১৮৯৭ সালে ফেরাউনের দেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল, এবং ঠিক সেই সময়েই ইহুদি জায়নবাদী আন্দোলনের (Zionist Movement) সূচনা হয়েছিল।

নিম্নে কুরআনের সেই অংশটি উল্লেখ করা হলো, যা ফেরাউনের দেহ-সম্পর্কিত সেই অশুভ-তাৎপর্যপূর্ণ ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণীটি দিয়ে শেষ হয়েছে:

وَ جٰوَزْنَا بِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُوْدُهٗ بَغْیًا وَّ عَدْوًا ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম আর ফির'আওন ও তার সৈন্য সামন্ত ঔদ্ধত্য ও সীমালঙ্ঘন করে তাদের পেছনে ছুটল, অতঃপর যখন সে ডুবতে শুরু করল তখন সে বলল, 'আমি ঈমান আনছি যে, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই যাঁর প্রতি বানী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

সূরা ইউনুস, আয়াত ৯০

آٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ

[আল্লাহ্ বললেন:] "এখন? অথচ এর আগে তুমি তো ছিলে অবাধ্য এবং ছিলে ফাসাদ (অশান্তি ও ধ্বংস) সৃষ্টিকারীদের একজন!"
(এই ঐশ্বরিক উত্তর স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল যে, ফেরাউনের ঈমান ঘোষণা এসেছিল অনেক দেরিতে এমন এক মুহূর্তে, যখন আর তা গ্রহণযোগ্য ছিল না।)

সূরা ইউনুস, আয়াত ৯১

فَالْیَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰیَةً ؕ وَ اِنَّ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰیٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ

আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পার।' অধিকাংশ মানুষই আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে নিশ্চিতই উদাসীন।"

সূরা ইউনুস, আয়াত ৯২

আল্লাহ কোন নিদর্শনটি সম্পর্কে সতর্কবাণী দিচ্ছিলেন?

আমাদের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ এমন এক জাতিকে সতর্ক করছিলেন, যারা ফেরাউনের মতোই জীবনযাপন করবে এবং তাদের পরিণতিও হবে ঠিক তার মতোই; এবং আল্লাহই সর্বোত্তম জানেন!

মারা যাওয়ার ঠিক আগে ফেরাউন বুঝতে পারল যে, সে নিজে খোদা নয়, আসল খোদা হলেন বনী ইসরাঈলের প্রভু আল্লাহ। তখন সে সেই খোদার উপর বিশ্বাস আনার কথা ঘোষণা করল। কিন্তু সমস্যা হলো, সে এই ঘোষণাটি দিয়েছিল পানির নিচে, যেখানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সাক্ষী ছিল না। যেই আল্লাহকে সে সারাজীবন অস্বীকার করেছে, তাঁর উপর বিশ্বাস আনার ঘোষণা দেওয়ার ঠিক পরেই সে মারা গেল।
আমাদের ব্যাখ্যা হলো, কুরআন এই হুঁশিয়ারিই দিয়েছে যে, যারা ঈসাকে মসীহ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা সকলেই ঠিক ফেরাউনের মতোই মৃত্যুবরণ করবে। (ঈসার) ইন্তেকালের পূর্বেই, তাঁর উপর ঈমান আনার ঘোষণা দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো বিকল্প পথ খোলা থাকবে না।
ঈসা (আঃ) যদি ইতিমধ্যেই মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে তো সেই ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণীটি এখনো পূরণ হয়নি। আর তার মানে দাঁড়ায়, ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা।

কিন্তু যদি আমরা কুরআনকে পরম সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দিই, তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী তাৎপর্য এই যে: ঈসা (আঃ) তখন ইন্তেকাল করেননি; না ক্রুশারোপণের ঘটনার সময়, না তার পরে।
যেহেতু কুরআন বলেছে যে, প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৩৫), তাই এটা নিশ্চিত যে, তাঁকে একদিন পৃথিবীতে ফিরে আসতেই হবে এবং তারপর অন্য সবার মতো মৃত্যুবরণ করতে হবে।

অতএব, এই ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণী নির্দেশ করে যে, যারা ঈসা (আঃ)কে মসীহ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। এটি তখন ঘটবে যখন তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। তবুও, তারা তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় মসীহ হিসেবে তাঁর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিলেও তখন তাদের জন্য এটি কোনো উপকারে আসবে না। কিয়ামতের দিনে তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করবেন, এবং তখন তারা সেই শাস্তি ভোগ করবে যা তাদের প্রাপ্য।

কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চিত করে যে, ঈসা (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় বা পরবর্তীতে কখনোই প্রকৃত মৃত্যু (যেখানে আল্লাহ কোনো প্রাণ গ্রহণ করেন এবং আর ফেরত দেন না) ভোগ করেননি। বরং তিনি এখনও মৃত্যুর জন্য বাকি আছেন, তাই তাকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। এবং ঠিক সেই সময়েই, তার ফেরত আসার পূর্বে, প্রতিটি ইহুদির জন্য অপরিহার্য হবে তাকে মসীহ হিসেবে স্বীকার করা।

কুরআনের এই অশুভ-তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীটির এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা, যা ইহুদি জগতকে ঠিক সেই মুহূর্তে শোনানো হয়েছিল, যখন তারা দম্ভভরে প্রচার করছিল যে, তারা কীভাবে মসীহকে হত্যা করেছে!

আরেকটি প্রতিবন্ধকতা

কেউ কেউ এমন বিশ্বাস পোষণ করেন যে, পূর্বোক্ত আয়াতে কুরআন যখন এমন এক জাতির কথা বলেছে, যারা তাঁর (ঈসার) মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে নিশ্চিতভাবেই মসীহ হিসেবে মেনে নেবে, তখন এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ক্রুশারোপণের সেই দিন থেকে শুরু করে প্রত্যেক ইহুদিই তার নিজের মৃত্যুর পূর্বে ঈসা (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করবে।
এটি সুস্পষ্টভাবেই একটি ভ্রান্ত ধারণা, কারণ তাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক যারা খ্রিস্টান বা মুসলিম হয়ে গিয়েছিল এবং একারণে তাদেরকে আর ইহুদি হিসেবে গণ্য করা হয় না, ক্রুশারোপণের দিন থেকে আজ পর্যন্ত যত ইহুদি মৃত্যুবরণ করেছে, তারা সকলেই ঈসাকে মসীহ হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন না করেই মারা গেছে।
এই মতের সমর্থকরা কুরআনে উল্লিখিত ‘কবলে মউত’ অর্থাৎ ‘মৃত্যুর পূর্বে’—এই সুস্পষ্ট বক্তব্যটিকে ‘মৃত্যুকালে’ বা ‘মৃত্যুর মুহূর্তে’ বলে ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর তারা এই যুক্তি উত্থাপন করেন যে, মৃত্যুর ঠিক সেই মুহূর্তে দেওয়া ঈমানের ঘোষণাকে প্রমাণ করার মতো কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকতে পারে না।
কিন্তু এই ধারণাটি কুরআনের বক্তব্যের সাথে মেলে না। যেমন, কুরআন ঘোষণা করেছে যে, যখন কারো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন যে ব্যক্তি মারা যাচ্ছে, তার অসিয়ত করা কর্তব্য:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে, যদি সে কোন সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ভিত্তিক অসিয়ত করবে। এটি মুত্তাকীদের দায়িত্ব।

সূরা আল-বাকারাহ ২:১৮০

এই ব্যাখ্যার সমর্থকেরা তখন তাদের শেষ যুক্তিটি পেশ করেন। তারা বলেন যে, কুরআনের আয়াতটি আসলে মসীহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সেই ঘোষণার কথা বলছে, যা কোনো ইহুদির ঠিক মৃত্যুর মুহূর্তে দেওয়া হয় যখন তার আত্মা শরীর ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়:

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ

"অতঃপর, কেন নয় যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়,"

সূরা আল-ওয়াকি'য়াহ, আয়াত ৮৩

তারা বলে যে, একজন ইহুদি ঈসাকে মসীহ হিসেবে মেনে নেওয়ার ঘোষণাটি দেবে ঠিক তার মৃত্যুর মুহূর্তে, আর একারণেই, সেই ঘোষণার সত্যতা যাচাই করার মতো কোনো প্রমাণ কখনোই পাওয়া যাবে না। আমরা এমন কোনো ব্যাখ্যা মানি না, যেখানে বলা হয়, মৃত্যুর সময় ঈমানের ঘোষণা দেওয়া হবে। কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে, ঘোষণাটি হবে 'মৃত্যুর আগে' (قبل الموت), 'মরার সময়' (حين الموت) নয়।
এই লেখক অধীর আগ্রহে সেই অপেক্ষায় আছেন, যেদিন ঈসা (আঃ) পুনরায় ফিরে আসবেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস, স্বয়ং মসীহ এসে সেদিন নিশ্চিত করবেন যে, কুরআনের ‘তাঁর মৃত্যুর পূর্বে’ এই শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যাটিই সঠিক; এবং এটি যে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুকে নির্দেশ করে, কোনো ইহুদির মৃত্যুকে নয় তাও তিনি দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে দেবেন।
সুতরাং, কুরআনের এই আয়াতটি সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা চূড়ান্তভাবে এটাই প্রমাণ করে যে, মসীহের প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে ইহুদি ইতিহাসে এক মহানাটকীয় ঘটনার সূত্রপাত হবে এমন এক অধ্যায়, যার কোনো তুলনা পুরো ইতিহাসে নেই।

যে জাতিটা দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে একরোখাভাবে ঈসা (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে অস্বীকার করে এসেছে, তারা সেদিন এমন এক অকাট্য সত্যের সামনে এসে দাঁড়াবে যে, তিনিই প্রকৃত মসীহ। এবং তখন একজনও বাদ যাবে না, সকলেই তাঁকে

মসীহ হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হবে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কুরআনের সেই অবশ্যম্ভাবী ও ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণতা লাভ করবে।

এই বইটি তাদের সেই চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কেই এক কঠোর সতর্কবার্তা উচ্চারণ করছে, যদি তারা মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার এই একগুঁয়েমিতে অটল থাকে।

কুরআন থেকে তৃতীয় প্রমাণ যে ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন

"আর ঈসা (আঃ) তো স্বয়ং কিয়ামতের এক চূড়ান্ত নিদর্শন। কিন্তু যেহেতু তাঁর পরেও পৃথিবীতে আরও একজন নবীর আগমন বাকি ছিল, তাই আল্লাহর নিকট তাঁকে তুলে নেওয়ার পূর্বে তাঁর পক্ষে কিয়ামতের সেই বিশেষ নিদর্শন হওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং, এ কথা অকাট্য যে, কেবল তাঁর পুনরায় ফিরে আসাটাই কিয়ামতের সেই নিদর্শন হিসেবে গণ্য হবে।"

কুরআন সূরা যুখরুফ-এর ৬১ নম্বর আয়াতে ঈসা (আঃ)-কে কিয়ামতের (সা'আহ) একটি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছে। এই 'কিয়ামত' বলতে ইতিহাসের শেষ সময়কে বোঝানো হয়েছে, পৃথিবীর ধ্বংসকে নয়।

কিয়ামতের চিহ্নগুলো সাধারণত তখনই প্রকাশ পেতে শুরু করে, যখন সব নবী আগমন শেষ করেছেন। তাই ঈসা (আঃ) তাঁর জীবদ্দশায় কিয়ামতের নিদর্শন হতে পারতেন না, কারণ তাঁর পরে আরও একজন নবী, মুহাম্মদ (ﷺ,) আগমন করবেন। তাহলে, ঈসা (আঃ) কীভাবে কিয়ামতের নিদর্শন হতে পারেন? এই প্রশ্নের একটিই মাত্র সম্ভাব্য উত্তর রয়েছে, এবং আমরা এখন সেই উত্তরের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি।

কিন্তু সেই উত্তরটি দেওয়ার আগে, আমাদেরকে প্রথমে কুরআনের আরবী পাঠের ব্যাকরণ এবং স্বরচিহ্ন (হরকত) সম্পর্কিত কিছু বিষয় পরিষ্কার করে নিতে হবে।

যেহেতু সেই আয়াতে (৪৩:৬১) কুরআন ঈসা (আঃ)-এর নাম সরাসরি উল্লেখ না করে, তাঁর জন্য একটি সর্বনাম (তাকে) ব্যবহার করেছে, সেহেতু আমাদের জন্য সেই সম্পূর্ণ অংশটি উদ্ধৃত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, যেখানে সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, যাতে পাঠক আরও স্পষ্টভাবে শনাক্ত করতে পারেন যে, সর্বনামটি প্রকৃতপক্ষে কাকে নির্দেশ করছে।

আমাদের এখানে কুরআনের কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। বরং, আমরা কেবল ব্যাকরণ, বাক্য গঠন এবং প্রাসঙ্গিকতার মতো সরল বিষয়গুলোই তুলে ধরব।

পবিত্র কুরআন এই আলোচ্য অংশটি (সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:৫৭-৬১) শুরুই করেছে মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আঃ)-এর নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে:

وَ لَمَّا ضُرِبَ ابۡنُ مَرۡيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوۡمُكَ مِنۡهُ يَصِدُّوۡنَ

"আর যখনই মরিয়ম-পুত্রকে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হয়, (হে মুহাম্মদ,) অমনি তোমার সম্প্রদায় এ নিয়ে হট্টগোল শুরু করে দেয়।"

সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:৫৭

পাঠকদেরকে লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে, কুরআন যখন পরবর্তী আয়াতে (নিম্নে প্রদত্ত) 'তিনি' সর্বনামটি ব্যবহার করেছে, তখন তা দ্বারা ঈসা (আঃ)-কেই নির্দেশ করা হয়েছে:

وَ قَالُوۡۤاءَ اٰلِهَتُنَا خَيۡرٌ اَمۡ هُوَ مَا ضَرَبُوۡهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُوۡنَ

"এবং তারা বলে (অর্থাৎ, প্রশ্ন করে), 'আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, নাকি সে (অর্থাৎ, ঈসা)?' [কিন্তু] তারা এই তুলনাটি তোমার সামনে কেবলই বিতণ্ডা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই উপস্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, তারা এক বিবাদপ্রিয় সম্প্রদায়!"

সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:৫৮

পরবর্তী আয়াতেও (নিম্নে প্রদত্ত), 'তিনি' সর্বনামটি সুস্পষ্টভাবে ঈসা (আঃ)-কেই নির্দেশ করেছে:

اِنۡ هُوَ اِلَّا عَبۡدٌ اَنۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ وَ جَعَلۡنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ

"তিনি (ঈসা) তো ছিলেন কেবলই একজন মানুষ আমাদেরই এক (অনুগ্রহপ্রাপ্ত) বান্দা, যার উপর আমরা করুণা বর্ষণ করেছিলাম এবং যাকে আমরা বনী ইসরাঈলের জন্য সত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বানিয়েছিলাম।"

সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:৫৯

একইভাবে, পরবর্তী আয়াতেও (নিম্নে প্রদত্ত) ঈসা (আঃ)-এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে:

وَ لَوۡ نَشَآءُ لَجَعَلۡنَا مِنۡكُمۡ مَّلٰٓئِكَةً فِى الۡاَرۡضِ يَخۡلُفُوۡنَ

"(তোমরা ঈসাকে দেওয়া আমার অলৌকিক ক্ষমতা, যেমন 'শিশুর দোলনা থেকে কথা বলা' এসব দেখেও তাকে জাদুকর বলেছ); কিন্তু আমি চাইলেই তোমাদের জায়গায় ফেরেশতাদের এনে বসাতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক আসত!"

সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:৬০

وَ اِنَّهٗ لَعِلۡمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمۡتَرُنَّ بِهَا وَ اتَّبِعُوۡنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيۡمٌ

"আর জেনে রেখো, তিনি (ঈসা) তো কেয়ামতের এক চূড়ান্ত নিদর্শন। সুতরাং, এ বিষয়ে তোমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করো না, বরং আমারই অনুসরণ করো।এটাই সরল পথ।"

সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:৬১

প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতা বিচার করলে আমাদের পাঠকগণ একমত হবেন যে, উপরিউক্ত আয়াতে ব্যবহৃত 'তিনি' সর্বনামটি ঈসা (আঃ)-কে নির্দেশ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই; আর একারণেই, কুরআন (উপরে) এই ঘোষণাই দিয়েছে যে, ঈসা হলেন কিয়ামতের এক নিদর্শন।

কুরআনের আরবী পাঠে স্বরচিহ্ন (হরকত)

এখন আমাদের অবশ্যই কুরআনের আরবী পাঠে ব্যবহৃত স্বরচিহ্ন (হরকত)-এর বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে, যা নির্ধারণ করে দেয় যে, কোন শব্দের উচ্চারণ কেমন হবে; কারণ একই শব্দ, ভিন্ন উচ্চারণের কারণে, সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে।

কুরআনের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলোতে কোনো স্বরচিহ্ন ছিল না, কারণ তৎকালীন আরব পাঠকদের জন্য এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বহুকাল পরে, মানুষই বর্তমানে ব্যবহৃত এই স্বরচিহ্নগুলো সংযোজন করেছে। তারা এমনটি করেছিলেন কারণ, অগণিত অনারব মানুষ নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসারী হয়ে তাঁর উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং কুরআন তিলাওয়াতের সুবিধার্থে তাদের সেই স্বরচিহ্নগুলোর প্রয়োজন ছিল।

কেবলমাত্র একজন অজ্ঞ ব্যক্তিই এমন কথা বলতে পারেন যে, মানুষের দ্বারা সংযোজিত এই স্বরচিহ্নগুলো ঐশীভাবে অবতীর্ণ কুরআনেরই অংশ এবং একারণেই তা ঐশীভাবে সংরক্ষিত।

আরেকটি প্রতিবন্ধকতা

কুরআনের অধিকাংশ লিখিত কপিতে স্বরচিহ্নগুলো এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে, তাতে উপরিউক্ত আয়াতে (আয-যুখরুফ, ৪৩:৬১) ع ل م শব্দটি 'আলাম' (অর্থাৎ নিদর্শন) হিসেবে না হয়ে, 'ইলম' (অর্থাৎ জ্ঞান) হিসেবে উচ্চারিত হয়।

এর আরবী মূলপাঠটি নিম্নোক্ত দুই রূপে লেখা যেতে পারে:

(১) وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ

(ওয়া ইন্নাহু লা-'আলামুল লিস্সা'আহ)

অর্থাৎ, তিনি (ঈসা) কিয়ামতের একটি নিদর্শন।

(২) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ

(ওয়া ইন্নাহু লা-'ইলমুল লিস্সা'আহ)

অর্থাৎ, তিনি (ঈসা) কিয়ামতের জ্ঞানস্বরূপ (বা জ্ঞান)।
এটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার যে, উপরের দ্বিতীয় পাঠটিতে ব্যবহৃত স্বরচিহ্নগুলো (যার ফলে অর্থ দাঁড়ায় 'তিনি, অর্থাৎ ঈসা, হলেন কিয়ামতের জ্ঞান') নিশ্চিতভাবেই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য।
কারণ, কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে যে, কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে, আর কারো কাছে নেই। সুতরাং, কোনো ব্যক্তিই কিয়ামতের 'জ্ঞান' হতে পারে না, কিংবা সেই জ্ঞান রাখাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঈসা কীভাবে কিয়ামতের 'জ্ঞান' হতে পারেন? যদি তাঁর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান না থাকে, তবে তিনি নিজে কীভাবে কিয়ামতের জ্ঞান হবেন? আর তাঁর কাছে সেই জ্ঞান

আসবেই বা কোত্থেকে, যখন কুরআন বলছে যে, কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই সংরক্ষিত?
যদি আয়াতটিকে এভাবে পড়া হয় যে, 'তিনি হলেন কিয়ামতের জ্ঞান', তবে তা হয় এক অর্থহীন বক্তব্য, নতুবা এক ভয়ংকর ও বিভ্রান্তিকর দ্ব্যর্থকতা; আর এমন ভাষা পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহর প্রতি আরোপ করা অসম্ভব।

ভিন্ন হরকত দিয়ে শব্দটির সঠিক উচ্চারণ করলে, আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়: 'তিনি হলেন কিয়ামতের নিদর্শন', এবং এই অর্থটিই সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ! যদি ঈসা (আঃ) নিজেই কিয়ামতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হন, তাহলে আমাদেরকে ঈসার সাথে সম্পর্কিত সেই চিহ্নটি খুঁজে বের করতে হবে, যা কিয়ামতের সবচেয়ে বড় চিহ্ন হওয়ার যোগ্যতা রাখে।
ঈসার সমস্ত মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাগুলো ছিল বনী ইসরাঈলীদেরকে এটা প্রমাণ করার জন্য যে, তিনিই আসল মসীহ। কিন্তু সেগুলোর একটিও কিয়ামতের সুস্পষ্ট নিদর্শন নয়। এমনকি, তাঁর পৃথিবীতে আসাকেও কিয়ামতের নিদর্শন বলা যায় না। কারণ, তিনি নিজেই বলে গেছেন যে, তাঁর পরে আরও একজন নবী আসবেন।

ঈসা (আঃ) নিজে কিয়ামতের একটি নিদর্শন হিসেবে কাজ করতে পারেন কেবল একটিই উপায়ে:
আর তা হলো, আল্লাহ তাঁকে তুলে নেওয়ার ২০০০ বছরেরও বেশি সময় পর যদি তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসেন। কুরআন তাঁর এই অলৌকিক ফিরে আসার কথাই বলেছে, যখন ঘোষণা করা হয়েছে:

... وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ ...

"... আর তিনি (ঈসা) তো অবশ্যই কিয়ামতের একটি নিদর্শন ..."
ঈসা (আঃ)-এর ফিরে আসার সবচেয়ে জোরালো ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছেন স্বয়ং নবী মুহাম্মদ (ﷺ)।
আর একারণেই আমরা নিশ্চিত যে, ঈসা (আঃ) কিয়ামতের একটি নিদর্শন আমাদের এই ব্যাখ্যাই সঠিক।
এবং সেই আয়াতে (আয-যুখরুফ, ৪৩:৬১) ع ل م শব্দটিতে মানুষের দেওয়া হরকত, যার ফলে এটিকে 'আলাম' বা নিদর্শন-এর পরিবর্তে 'ইলম' বা জ্ঞান হিসেবে পড়া হয়, তা ভুল। কুরআনে কোনো ভুল থাকতে পারে না, কিন্তু মানুষ যখন কুরআনে হরকত বসাতে যায়, তখন তারা ভুল করে।

কুরআন থেকে চতুর্থ প্রমাণ যে ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন

যেহেতু ঈসা (আঃ) শিশুকালে দোলনা থেকে অলৌকিকভাবে কথা বলেছেন, তাই এটা নিশ্চিত যে, প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবেও তাঁকে অলৌকিকভাবে কথা বলতে হবে। আল্লাহর কাছে তুলে নেওয়ার আগে তিনি তেমনটি করেননি। কাজেই, ২০০০ বছরেরও বেশি সময় পর যখন তিনি ফিরে আসবেন, তখন তাঁর সেই 'কথা বলাটাই' হবে এক অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনা।

সূরা আলে ইমরানের (৩:৪৫-৭) নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে মরিয়ম (আঃ)-কে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি একজন পুত্রসন্তান লাভ করবেন, যিনি হবেন মসীহ; কিন্তু অতঃপর তাঁকে এও জানানো হয় যে, তিনি দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সেও মানুষের সাথে কথা বলবেন:

اِذۡ قَالَتِ الۡمَلٰٓئِکَۃُ یٰمَرۡیَمُ اِنَّ اللّٰہَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَۃٍ مِّنۡہُ ۖ اسۡمُہُ الۡمَسِیۡحُ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ وَجِیۡہًا فِی الدُّنۡیَا وَ الۡاٰخِرَۃِ وَ مِنَ الۡمُقَرَّبِیۡنَ

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল, 'হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, যে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'

সূরা আলে ইমরান ৩:৪৫

وَ یُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الۡمَہۡدِ وَ کَہۡلًا وَّ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ

আর সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনায় ও পরিণত বয়সে এবং সে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা আলে ইমরান ৩:৪৬

এখন আমাদের সেই ঘটনাগুলো খুঁটিনাটিসহ বর্ণনা করা আবশ্যক, যার মধ্য দিয়ে দোলনা থেকে মসীহের অলৌকিকভাবে কথা বলার ঐশ্বরিক নিদর্শনটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। কুরআনের সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে যে, একবার মরিয়ম (আঃ) তাঁর ঘরবাড়ি ও আপনজনদের ছেড়ে সম্পূর্ণ একা পূর্বদিকের একটি জায়গায় চলে গিয়েছিলেন:

وَ اذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

আর স্মরণ কর এই কিতাবে মারইয়ামকে যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের কোন এক স্থানে চলে গেল।

সূরা মারইয়াম ১৯:১৬

ঠিক সেই সময়েই, যখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একাকী এবং তাঁর পাশে কেউই ছিল না, তখন ফেরেশতা জিবরাঈল তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এই বার্তা নিয়ে উপস্থিত হলেন যে, তিনি একজন পুত্রসন্তান লাভ করবেন, যিনি হবেন মসীহ।
অতঃপর যখন তিনি গর্ভবতী হলেন যা ছিল এক অলৌকিক ঘটনা, যেহেতু তিনি তখনও কুমারী ছিলেন তখন তিনি আরও দূরবর্তী এক গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন:

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا

তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তা নিয়ে দূরবর্তী একটি স্থানে চলে গেল।

সূরা মরিয়ম, ১৯:২২

অতঃপর পবিত্র কুরআন সন্তান প্রসবকালে তাঁর সেই অসহনীয় যন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরেছে, যখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একাকী:

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

সন্তান প্রসবের বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষতলের দিকে তাড়িত করল। সে বলে উঠল, 'হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম আর (মানুষের) স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে যেতাম!'

সূরা মরিয়ম, আয়াত ১৯:২৩

ঠিক সেই সময় একটি কণ্ঠ (জিবরাঈল) তাঁর সাথে কথা বলল। এটি গর্ভের সন্তানের কণ্ঠস্বর হতে পারে না। কারণ, ফেরেশতা জিবরাঈল আগেই বলে দিয়েছিলেন যে, মসীহ অলৌকিকভাবে কথা বলবেন শুধু দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর। তিনি যে গর্ভের ভেতর থেকেও কথা বলবেন, এমন কথা ফেরেশতা কখনোই বলেননি। কাজেই, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, তিনি ফেরেশতা জিবরাঈলের কণ্ঠই শুনেছিলেন, আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন!

জিবরাঈল তাঁকে খাওয়ার জন্য খেজুরের দিকে এবং পাশে থাকা একটি ছোট ঝর্ণার দিকে পথ দেখাল, যেখানে তিনি সতেজ হতে পারবেন:

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

তখন তার নিচ থেকে সে তাকে ডেকে বলল যে, 'তুমি চিন্তা করো না। তোমার রব তোমার নিচে একটি ঝর্ণা সৃষ্টি করেছেন'।

সূরা মরিয়মে ১৯:২৪

وَ هُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

আর তুমি খেজুর গাছের কান্ড ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, তাহলে তা তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুর ফেলবে'।

সূরা মরিয়মে ১৯:২৫

এরপর জিবরাঈল তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আদেশ দিল শিশুর জন্মের এই দিনে 'নীরবতা দিবস' পালন করতে হবে। তাঁকে একদিনের জন্য সবার সাথে কথা বলতে নিষেধ করা হলো:

فَكُلِىْ وَ اشْرَبِىْ وَ قَرِّىْ عَيْنًا فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا

'অতঃপর তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। আর যদি তুমি কোন লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, 'আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব আজ আমি কোন মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব না'।

সূরা মরিয়মে ১৯:২৬

এখন আমাদের একটু থেমে পাঠককে অন্য একটি ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে, যা এই একই সূরা মরিয়মেরই আগের দিকে বলা হয়েছে। সেখানে যাকারিয়া (আঃ) মহান আল্লাহর কাছে এমন একজন পুত্র চেয়েছিলেন, যিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন। যখন ফেরেশতা এসে তাঁকে জানালেন যে, আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেছেন, তখন যাকারিয়া আল্লাহর কাছে একটি চিহ্ন চাইলেন। তখন তাঁকে জানানো হলো যে, সেই চিহ্নটি হলো তাঁকে তিন দিনের জন্য চুপ থাকতে হবে:

قَالَ رَبِّ اجۡعَلۡ لِّیۡۤ اٰیَۃً ؕ قَالَ اٰیَتُکَ اَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَیَالٍ سَوِیًّا

সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আমার জন্য একটা চিহ্ন স্থির করে দিন।' তিনি বললেন, 'তোমার চিহ্ন এই যে, তুমি তিন রাত মানুষের সঙ্গে কথা বলবে না যদিও তুমি কথা বলতে সক্ষম।'

সূরা মরিয়ম, ১৯:১০

একজন পুরুষের জন্য আল্লাহ তিন দিন চুপ থাকার নিয়ম করেছিলেন। কাজেই, আমরা সহজেই বুঝতে পারি, মরিয়ম (আঃ) একজন নারী বলেই তাঁর জন্য মাত্র একদিনের নিয়ম করা হয়েছিল।

এটা কি কোনোভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে যে, আল্লাহ একজন পুরুষের জন্য তিন দিনের কঠিন নির্দেশ দেবেন, আর মরিয়মের মতো একজন নারীর জন্য তার সমান বা তার চেয়েও বেশি সময়ের নির্দেশ দেবেন? এটা সাধারণ জ্ঞান এবং যুক্তির বাইরে! কাজেই, এই সত্যকে অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই যে, মরিয়মকে মাত্র একদিনের জন্যই চুপ থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছিল আর সেই দিনটি ছিল তাঁর সন্তানের জন্মের দিন, মরিয়মের নীরবতা পালনের পেছনের যে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা ছিল, তা এক নাটকীয় রূপ নিলো, যখন তিনি তাঁর নবজাতক শিশু কে সাথে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসলেন। তারা জানত যে, তিনি তখনও অবিবাহিতা; তারা চিনতে পারল যে, শিশুটি তাঁরই সন্তান, এবং তারা তৎক্ষণাৎ তাঁকে ব্যভিচারের মতো মহাপাপে অভিযুক্ত করল:

فَاَتَتۡ بِہٖ قَوۡمَہَا تَحۡمِلُہٗ ؕ قَالُوۡا یٰمَرۡیَمُ لَقَدۡ جِئۡتِ شَیۡئًا فَرِیًّا

অতঃপর সে তার সন্তানকে বয়ে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে আসল। তারা বলল, 'হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত জিনিস নিয়ে এসেছ!

সূরা মারিয়াম ১৯:২৭

یٰۤاُخۡتَ ہٰرُوۡنَ مَا کَانَ اَبُوۡکِ امۡرَ اَ سَوۡءٍ وَّ مَا کَانَتۡ اُمُّکِ بَغِیًّا

'হে হারূনের বোন! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না। আর তোমার মা-ও ছিল না ব্যভিচারিণী'।

সূরা মারিয়াম, ১৯:২৮

তার লোকেরা যেভাবে তাঁকে জেরা শুরু করেছিল, তার পরিষ্কার অর্থ হলো তারা একজন অবিবাহিতা নারীর কোলে সন্তান দেখে, তাঁকে ব্যভিচারের মতো মহাপাপ করার জন্য দোষারোপ করছিল।
মরিয়ম (আঃ) নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য তাদের কোনো জবাব দেননি। তিনি এমনকি কথাও বলেননি। তিনি শুধু শিশুটির দিকে ইশারা করলেন; আর তারা বলল, 'আমরা দোলনায় থাকা একটি শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলব?

فَاَشَارَتۡ اِلَيۡهِ ؕ قَالُوۡا كَيۡفَ نُكَلِّمُ مَنۡ كَانَ فِىۡ الۡمَهۡدِ صَبِيًّا

তখন মারইয়াম তার ছেলের দিকে ইশারা করল। তারা বলল, 'আমরা কোলের বাচ্চার সঙ্গে কীভাবে কথা বলব?'

সূরা মারিয়াম, ১৯:২৯

ব্যভিচারের মতো অপবাদ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সেই মুহূর্তে মরিয়ম কেন কিছু বললেন না? নিজেকে না বাঁচিয়ে তিনি কেন শিশুটির দিকে ইশারা করলেন? তিনি কেন চুপ ছিলেন? কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো: দোলনায় থাকা শিশুটির বয়স কত ছিল?
এইসব প্রশ্নের উত্তর একটাই। মরিয়ম সেই মুহূর্তে চুপ ছিলেন কারণ, তিনি তাঁর সন্তানের জন্মের দিনে অর্থাৎ একদিনের জন্য চুপ থাকার আদেশ পেয়েছিলেন। আর যখন তাঁর লোকেরা তাঁকে দোষারোপ করছিল, তখন দিনটি যেহেতু শেষ হয়নি, তাই তাঁর সেই আদেশটিও তখনও চলছিল।
সুতরাং, দোলনায় যে শিশুটি ছিল, সে ছিল এমন এক নবজাতক, যার জন্মের পর জীবনের একটি পূর্ণ দিবসও অতিক্রান্ত হয়নি।

কাজেই, এক নবজাতক শিশুই তখন দোলনা থেকে অলৌকিকভাবে কথা বলে উঠল এবং ঘোষণা দিল:

قَالَ اِنِّىۡ عَبۡدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِىَ الۡكِتٰبَ وَ جَعَلَنِىۡ نَبِيًّا

(শিশুটি) বলল,
"নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন।"

সূরা মারিয়াম, ১৯:৩০

আমাদেরকে এই ঘটনাটির এত খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতে হয়েছে, যাতে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায় যে, দোলনা থেকে যে শিশুটি কথা বলেছিল, তার বয়স ছিল মাত্র একদিন। আর একারণেই, শিশুটি যে অলৌকিকভাবে কথা বলেছিল, তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।

আরেকটি নতুন প্রতিবন্ধকতা

কুরআনে এত নিখুঁতভাবে প্রমাণ করার পরেও যে, দোলনা থেকে কথা বলা শিশুটি ছিল মাত্র একদিনের এক নবজাতক এখনও এমন লোক আছেন, যারা আমাদের অন্য কিছু বিশ্বাস করাতে চান।
মুহাম্মদ আসাদ দোলনা থেকে শিশুর কথা বলার বিষয়ে এই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যটি করেছেন:

"যেহেতু এটা চিন্তাই করা যায় না যে, একজন ব্যক্তি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় পুরোপুরি পরিণত হওয়ার আগেই নবী হতে পারেন বা ওহী পেতে পারেন, একারণে ইকরিমা ও দাহহাক (তাবারীর বর্ণনামতে) এর ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, 'আল্লাহ এই বিধান দিয়েছেন (ক্বদা) যে, তিনি আমাকে ওহী দেবেন...' ইত্যাদি। অর্থাৎ, তারা এটিকে ভবিষ্যতের একটি ইঙ্গিত হিসেবে দেখেন। তাবারী নিজেও পরের আয়াতের জন্য একই ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন: 'তিনি বিধান দিয়েছেন যে, তিনি আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ দেবেন'। তবে, পুরো ঘটনাটিকে (আয়াত ৩০-৩৩) এভাবেও দেখা যেতে পারে যে, এই কথাগুলো ঈসা (আঃ) অনেক পরে বলেছিলেন—অর্থাৎ, যখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন এবং তাঁকে নবুয়তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অন্য কথায়, এটিকে ঈসার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের নৈতিক আদর্শগুলোর একটি পূর্বাভাস হিসেবে ধরা যেতে পারে। বিশেষ করে, তাঁর এই গভীর উপলব্ধি যে তিনি কেবলই 'আল্লাহর একজন বান্দা'।"

(মুহাম্মদ আসাদ, সূরা মরিয়মের অনুবাদ ও ভাষ্য, ১৯:৩০)

আসাদ আবারও দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, সেই নবজাতক মসীহ আসলে দোলনায় থাকা একটি ছোট ছেলে ছিল। আয়াতটির তাঁর করা অনুবাদটি নিচে দেওয়া হলো:

فَاَشَارَتۡ اِلَیۡهِ ؕ قَالُوۡا کَیۡفَ نُکَلِّمُ مَنۡ کَانَ فِی الۡمَهۡدِ صَبِیًّا

তখন মারইয়াম তার ছেলের দিকে ইশারা করল। তারা বলল, 'আমরা কোলের বাচ্চার সঙ্গে কীভাবে কথা বলব?'

সূরা মারিয়াম, ১৯:২৯

আহমদী পণ্ডিত, মুহাম্মদ আলী, দোলনায় কথা বলা সেই নবজাতকের বয়সের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কল্পনার এমন এক জগতে পাড়ি জমিয়েছেন, যা রীতিমতো অবিশ্বাস্য। তিনি দাবি করেছেন, ঈসা (আঃ) সেই সময়ে নাকি ইতিমধ্যেই একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক ছিলেন!

আমরা এখন সেই সুসংবাদের নিকট ফিরে যাচ্ছি, যা মরিয়ম (আঃ)-কে দেওয়া হয়েছিল, যখন ফেরেশতা জিবরাঈল একজন মানুষের রূপ ধারণ করে তাঁর নিকট এসে জানিয়েছিলেন যে, তিনি একজন পুত্রসন্তান লাভ করবেন, যিনি হবেন মসীহ।

وَ یُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الۡمَهۡدِ وَ کَهۡلًا وَّ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ

আর সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনায় ও পরিণত বয়সে এবং সে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।

সূরা আলে ইমরান ৩:৪৬

আমরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছি যে, দুটি নিদর্শনের মধ্যে প্রথমটি (অর্থাৎ, দোলনা থেকে কথা বলা) তখনই পূর্ণতা লাভ করেছিল, যখন সেই শিশুটি দোলনা থেকে কথা বলেছিল। নবজাতক শিশুরা কথা বলে না; একারণেই এটি ছিল এক অলৌকিক ঘটনা (মু'জিযা)।

এখন আমরা দুটি নিদর্শনের দ্বিতীয়টির (অর্থাৎ, তিনি পরিণত বয়সেও কথা বলবেন) দিকে দৃষ্টিপাত করছি এবং তা করতে গিয়েই আমরা এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। আর তা হলো, প্রাপ্তবয়স্কদের কথা বলা তো নিতান্তই এক স্বাভাবিক বিষয়, এবং এই শিশুটি কখনোই বোবা হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখায়নি। বরং, তিনি কথা বলতে পারতেন এবং সারাজীবন ধরেই কথা বলেছেন, যতক্ষণ না তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হন এবং অবশেষে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

দোলনায় থাকা একটি শিশুর কথা বলা নিঃসন্দেহে এক অলৌকিক ঘটনা, কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্কের কথা বলার মধ্যে তো কোনোই বিশেষত্ব নেই! একজন প্রাপ্তবয়স্ক কীভাবে অলৌকিকভাবে কথা বলতে পারেন? আর এই অলৌকিক ঘটনাটি যা এখনও ঘটেনি,তা কখন ঘটবে?

যদিও ভবিষ্যদ্বাণীটির প্রথম অংশটি তখনই পূর্ণতা লাভ করেছিল, যখন ঈসা (আঃ) দোলনা থেকে অলৌকিকভাবে কথা বলেছিলেন, তথাপি ভবিষ্যদ্বাণীটির দ্বিতীয় অংশটি যে পূর্ণ হয়েছে, তার কোনোই প্রমাণ নেই।
ফেরেশতা কর্তৃক মরিয়মকে (আঃ) দেওয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণীর রহস্য উন্মোচনের পথ কেবল একটাই। এবং কুরআন নিজেই সেই পথের সন্ধান দিয়েছে শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ যখন ঈসার সাথে কথা বলবেন, ঠিক সেই কথোপকথনের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। আর সেই মুহূর্তটি আসবে ভবিষ্যদ্বাণীটির উভয় অংশই অর্থাৎ, দোলনা থেকে কথা বলা এবং পরিণত বয়সে কথা বলা পূর্ণতা লাভের পরে।

আল্লাহ বলেন:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا

"স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম। তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সেও মানুষের সাথে কথা বলতে...'"

সূরা আল-মায়িদাহ ৫:১১০

কুরআনের এই আয়াতটি এটা প্রমাণ করে যে, ঈসা (আঃ) দোলনা থেকে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উভয় ক্ষেত্রেই অলৌকিকভাবে কথা বলেছিলেন। আর তিনি উভয়বারই এমনটি করতে পেরেছিলেন কারণ, মহান আল্লাহ তাঁকে পবিত্র আত্মা, অর্থাৎ ফেরেশতা জিবরাঈলের মাধ্যমে শক্তি যুগিয়েছিলেন।

এখন আমরা মরিয়ম (আঃ)-কে দেওয়া সেই নিদর্শনের ব্যাখ্যা করতে পারি, যেখানে বলা হয়েছিল যে তাঁর শিশুপুত্র দোলনা থেকে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও কথা বলবেন।

আর এই ব্যাখ্যাটি মহান আল্লাহ শেষ বিচারের দিনে নিশ্চিত করেছেন, যখন তিনি বলেছেন যে, ঈসা (আঃ) দোলনায় এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয় অবস্থাতেই কথা বলেছিলেন। পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কারণেই নবজাতক শিশুটি দোলনা থেকে কথা বলতে পেরেছিল। যদিও প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে অলৌকিকভাবে কথা বলার নিদর্শনটি এখনও ঘটেনি, কিন্তু আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, এটাও মসীহের জীবনে পবিত্র আত্মার হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই ঘটবে।

যদিও মসীহ মৃতকে জীবন দেওয়া, অন্ধকে দৃষ্টি দেওয়া, কুষ্ঠরোগী ভালো করার মতো অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে তাঁর কথা বলার মধ্যে এমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ নেই, যা পবিত্র আত্মার সাহায্যে ঘটেছে। তিনি সেইসব অলৌকিক কাজ করার আগে, এবং করার পরেও মানুষের সাথে কথা বলতে পারতেন। আর ইতিহাসে কেউই কখনো দাবি করেননি যে, প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে তাঁর কথা বলার ক্ষমতাটাই একটা মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা ছিল। মু'জিযা তাঁর কথা বলার ক্ষমতায় ছিল না। বরং, তিনি যে কাজগুলো করতেন, সেগুলোই ছিল মু'জিযা। যেহেতু ক্রুশের ঘটনার সময় মসীহ মারা যাননি, বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন, তাই আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, তাঁকে একদিন এই পৃথিবীতে ফিরতেই হবে। আর যখন তিনি ফিরে আসবেন, তখন তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পুনরায় মানুষের সাথে কথা বলা শুরু করবেন। আর তাঁর এই কথা বলাই হবে সেই ভবিষ্যদ্বাণীটির পূর্ণতা, যে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবেও অলৌকিকভাবে কথা বলবেন ঠিক যেমনটি তিনি বলেছিলেন দোলনায় থাকা এক নবজাতক শিশু হিসেবে।

ফেরেশতা জিবরাঈল কর্তৃক মরিয়ম (আঃ)-কে দেওয়া সেই নিদর্শন যে তাঁর শিশুপুত্র দোলনায় এবং পরিণত বয়সে কথা বলবেন এর আর কোনো বিশ্বাসযোগ্য বা যৌক্তিক ব্যাখ্যা হতে পারে না।
আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন!

কুরআন থেকে পঞ্চম প্রমাণ যে ঈসা (আঃ) ফিরে আসবেন

"আল্লাহ কেন ঈসাকে কুরআন শিখিয়েছিলেন এর আর কোনো ব্যাখ্যা নেই, শুধু একটি ছাড়া:তিনি যখন ফিরে আসবেন, তখন তাঁর নিজের উম্মত এবং শেষ উম্মতের মধ্যে সংযোগ স্থাপনএবং সঠিক পথ দেখানোর জন্য তাঁর এই জ্ঞানের দরকার হবে।"

এখন আমরা কুরআন থেকে পঞ্চম এবং সর্বশেষ সেই প্রমাণটি উপস্থাপন করছি, যা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ঈসা (আঃ) একদিন এই পৃথিবীতে আবার প্রত্যাবর্তন করবেন। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন (সূরা আল-মায়েদাহ, ৫:১১০) ব্যাখ্যা করেছে যে, পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী হওয়ার ফলেই ঈসা (আঃ) দোলনায় শিশু অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে উভয় ক্ষেত্রেই অলৌকিকভাবে কথা বলতে পারতেন। কিন্তু সেই একই আয়াত এরপরই তাৎক্ষণিকভাবে এই ঘোষণাও দেয় যে, আল্লাহ তাঁকে তিনটি আসমানী কিতাব শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁকে এমন প্রজ্ঞা দান করেছিলেন, যা দ্বারা তিনি একইসাথে তিনটি কিতাবের মধ্যেই সমন্বয় সাধন করতে পারেন:

... وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ...

"...এবং (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত (বিশেষ প্রজ্ঞা), তাওরাত এবং ইনজিল শিক্ষা দিয়েছিলাম..."

সূরা আল-মায়িদাহ ৫:১১০

পাঠকদের মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ ও ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে এই কথোপকথনটি হবে কিয়ামতের দিনে,ইতিহাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর।
আমরা শীঘ্রই জানতে পারব যে, এই সংবাদটি মরিয়ম (আঃ)-কে ফেরেশতা জিবরাঈল পূর্বেই পৌঁছে দিয়েছিলেন ঠিক সেই সময়েই, যখন তাঁকে এই সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছিল যে, তিনি মসীহের জন্ম দেবেন।
ব্যাখ্যায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বে, প্রথম যে বিষয়টি আমাদের নিষ্পত্তি করতে হবে, তা হলো এই আয়াতে 'কিতাব' বলতে কোন ধর্মগ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে। নিম্নে উপস্থাপিত প্রমাণটিই আমাদের জন্য ‘কিতাব’ বা ‘ধর্মগ্রন্থ’ হিসেবে কুরআনকে শনাক্ত করার জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ কুরআনের এই আয়াতে তাওরাত ও ইনজিলের পাশাপাশি ‘কিতাব’ বা ‘ধর্মগ্রন্থ’-এর উল্লেখ করেছেন:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ

"(হে মুহাম্মদ), তিনিই তোমার উপর ধাপে ধাপে ‘কিতাব’ (কুরআন) নাযিল করেছেন সত্যসহ, যা এর আগের (কিতাবগুলোর) যা কিছু টিকে আছে, তাকে সমর্থন করে। আর তিনিই তো তাওরাত ও ইনজিল নাযিল করেছিলেন।"

সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩

নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর যে একমাত্র ‘কিতাব’ নাযিল হয়েছে, তা হলো কুরআন। কাজেই, মহান আল্লাহ যখন উপরের আয়াতে ‘কিতাব’, এবং তারপর তাওরাত ও ইনজিলের কথা বলেছেন, তখন তিনি কুরআনকেই বুঝিয়েছেন।

যেহেতু ফেরেশতা জিবরাঈলও ঠিক একই ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, যখন তিনি মরিয়ম (আঃ)-কে জানিয়েছিলেন যে,আল্লাহ তাঁর পুত্রকে ‘আল-কিতাব’, হিকমত, তাওরাত এবং ইনজিল শিক্ষা দেবেন, সেহেতু এর তাৎপর্য এই যে, নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত ‘কিতাব’ শব্দটি কুরআনকেই নির্দেশ করছে:

... وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ...

"...এবং তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (ঈসাকে) ‘আল-কিতাব’, হিকমত (বিশেষ প্রজ্ঞা), তাওরাত এবং ইনজিল শিক্ষা দেবেন..."

সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৮

সূরা তাওবায় তাওরাত ও ইনজিলের সাথে সাথে কুরআনের নামও উল্লেখ করা হয়েছে:

... وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ...

"...তাওরাত, ইনজিল এবং কুরআনে করা তাঁর এক সত্যিকারের ওয়াদা..."

সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ১১১

যেহেতু এখন এটি অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো যে, আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) ইনজিল ও তাওরাতের পাশাপাশি কুরআনও শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেহেতু আমাদের এখন এটিই খুঁজে বের করতে হবে: তিনি কেন এমনটি করেছিলেন,যখন কি না ঈসাকে এই পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়ার ৬০০ বছর পর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল ?

আল্লাহ কেন ঈসাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন এর একটিই মাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা হতে পারে:

ঈসা (আঃ) একদিন এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। আর যখন তিনি ফিরে আসবেন, তখন তাঁর অবশ্যই কুরআনের জ্ঞান দরকার হবে। কারণ, তাঁকে তখন দুটি উম্মতের বিষয় সামলাতে হবে: একটি তাঁর নিজের উম্মত, যার নেতা হবেন তিনি নিজে, এবং অন্যটি নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মত, যার নেতা হবেন ইমাম আল-মাহদী। দুটি উম্মতেরই নিজস্ব শরীয়ত বা আইন থাকবে, আর এই দুই আইনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ঈসা (আঃ)-এর কুরআনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন হবে। আর এই বিষয়টি নিয়েই এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার হলো, কুরআনের এই দুটি আয়াত অর্থাৎ, সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৮ এবং সূরা আল-মায়েদাহ, ৫:১১০ কুমারী মরিয়মের পুত্র মসীহ ঈসা (আঃ)-এর ফিরে আসার আরও একটি প্রমাণ দেয়।

অধ্যায়: ৪

মসীহের প্রত্যাবর্তনের প্রভাব ও পরিণতি

কিছু সুস্পষ্ট কারণেই এই লেখক মনে করেন যে, মসীহ ফিরে আসার পর ঠিক কী কী ঘটবে, সে সম্পর্কে মানবজাতিকে পুরোপুরি জানানো হয়নি। কারণ, সেই জ্ঞান কেবল মহান আল্লার, ই আছে এবং তাদের কাছে, যাদের তিনি তা জানাতে চেয়েছেন। কাজেই, এই বিষয়ে আমরা যা কিছু জানতে পারি, তা অবশ্যই কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর হাদীস থেকেই জানতে হবে। তবে সেই তথ্য থেকে আমরা এই সংবাদ পেয়ে স্বস্তি পাই যে, ইতিহাস এক অসাধারণ উপায়ে শেষ হবে। আর সেই সমাপ্তি ঘটবে সেই সত্যের বিজয়ের মাধ্যমে, যা মসীহ নিয়ে এসেছিলেন এবং যা কুরআনে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মসীহ সেই একই সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করবেন, যাদের প্রতি তাঁকে প্রথমবার প্রেরণ করা হয়েছিল।

আমরা যেহেতু কুরআনের আলোকে এটি অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠা করেছি যে, কুমারী মরিয়ম-পুত্র মসীহ ঈসা (আঃ) একদিন এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, তিনি ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করার জন্যই প্রত্যাবর্তন করবেন, সেহেতু আমাদের জন্য এটি নির্ধারণ করা অপরিহার্য যে: তিনি কাদের উপর শাসন করবেন? এবং ফলস্বরূপ, তিনি কাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবেন?

কুরআন ঘোষণা করেছে যে, নবী মুহাম্মদ (ﷺ) সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু মসীহ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? কুরআন দুইবার আমাদেরকে অবহিত করেছে যে, মসীহকে বনী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ

"...এবং (তিনি হবেন) বনী ইসরাঈলের একজন রাসূল..."

সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৯

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم

"আর (স্মরণ করো,) যখন মরিয়ম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন, 'হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল...'"

সূরা আস-সফ, আয়াত ৬

যেহেতু তাঁকে বনী ইসরাঈল জাতির কাছেই পাঠানো হয়েছিল, এর সোজা অর্থ হলো, তিনি তাদের কাছেই ফিরে আসবেন এবং সেই লোকদের নিয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্রের উপর শাসন করবেন। আর এমন রাষ্ট্রের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীও থাকবে না; সুতরাং, এটিই হবে বিশ্বের প্রধান শাসক রাষ্ট্র।

কুরআন প্রকৃতপক্ষে এই ইঙ্গিতই দেয় (দেখুন সূরা আল-বাকারাহ, ২:১০৬) যে, আল্লাহ তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ কোনো বিধানকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন এবং তার পরিবর্তে এমন কিছু স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যা হয় পূর্ববর্তী বিধান অপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমতুল্য। এই ধরনের পরিবর্তনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো রোজার বিধান। পূর্বে (তাওরাতে) এমন নিয়ম ছিল যে, রোজা শুরু হবে সূর্যাস্তের সাথে সাথে, অর্থাৎ যখন দিনের সমাপ্তি ঘটে এবং রাতের আগমন হয়, এবং তা অব্যাহত থাকবে পরবর্তী সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু যারা নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে অনুসরণ করেন, তাদের জন্য কুরআনে এই বিধান পরিবর্তন করে এমন রোজা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা শুরু হয় ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে এবং তা অব্যাহত থাকে রাত পর্যন্ত, অর্থাৎ সূর্যাস্ত পর্যন্ত, যখন দিনের অবসান ঘটে এবং রাতের সূচনা হয়।

কাজেই, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজে এই ঘোষণাটি পরিবর্তন করছেন যে, মসীহকে বনী ইসরাঈলের কাছেই পাঠানো হয়েছিল, এবং তার জায়গায় আরও ভালো বা একই রকম কোনো ঘোষণা আনছেন, এবং সেই পরিবর্তনটি ওহী বা কোনো নবীর মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে না জানাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কারোই এই অধিকার নেই যে, সে নিজের মতো করে কুরআন বা হাদীসের ব্যাখ্যা করে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে এই কথা বলে বেড়াবে যে, আল্লাহর একটি ঘোষণা বদলে গেছে এবং ইতিহাসের শেষে একটাই উম্মত থাকবে।

যারা এই দায়িত্বজ্ঞানহীন বিশ্বাসটি রাখে, তারা মনে করে যে, মসীহ নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের একজন হয়ে ফিরে আসবেন, নিজের উম্মতের নেতা হিসেবে নয়।

যেহেতু কুরআনে এমন কোনো তথ্য নেই যে, আল্লাহ তাঁর এই ঘোষণা পরিবর্তন করেছেন যে তিনি মসীহকে বনী ইসরাঈল জাতির কাছে পাঠিয়েছিলেন, এবং যেহেতু এমন কোনো প্রমাণও নেই যে, নবী মুহাম্মদ (ﷺ) কখনোই স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তা পরিবর্তিত হয়েছে, সেহেতু এর সোজা অর্থ হলো মসীহ যখন ফিরে আসবেন, তখন তিনি ঠিক সেই লোকদের কাছেই ফিরে আসবেন, যাদের কাছে তাঁকে প্রথমবার পাঠানো হয়েছিল। পার্থক্য শুধু এটুকুই হবে যে, সেই সময়ে তাদের নাম ছিল 'বনী ইসরাঈল', আর তাঁর ফিরে আসার সময়ে তাদের নাম হবে 'আহলে কিতাব' বা 'কিতাবধারী জাতি'। আর এই নাম পরিবর্তনের ফলেই, যারা জন্মসূত্রে বনী ইসরাঈল নয়, কিন্তু ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়েছে, তারাও সেই বিশ্বাসীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে, যাদের কাছে মসীহকে ফেরত পাঠানো হবে। প্রকৃত মসীহকে জেরুজালেম থেকেই বিশ্ব শাসন করতে হবে, যাতে তিনি সোলায়মানের (আঃ) সেই স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনতে পারেন, যখন তাঁর পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্রই ছিল বিশ্বের প্রধান শাসক রাষ্ট্র।

আর ঠিক এই কারণেই, দাজ্জাল, অর্থাৎ ভণ্ড মসীহ, বাধ্য হবে জেরুজালেমকে রাজধানী করে তার ভুয়া ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে, যাতে সেও জেরুজালেম থেকেই সারা বিশ্বের উপর নিজের শাসন অর্থাৎ, 'প্যাক্স জুডাইকা' চালু করতে পারে।

এই গ্রন্থটি ভণ্ড মসীহ দাজ্জাল বা অ্যান্টিক্রাইস্ট-এর কোনো বিশদ বিবরণ প্রদান করে না; তবে, আমরা আমাদের রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে এই বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করেছি, এবং আমরা ইচ্ছা রাখি যে, ইনশাআল্লাহ, এই গ্রন্থটির পরবর্তী আমাদের অন্য একটি গ্রন্থে এই বিষয়ে আরও তথ্য ও বিশ্লেষণ তুলে ধরব।

যেহেতু মসীহ জেরুজালেম থেকেই একদিকে যেমন বিশ্ব শাসন করবেন, তেমনই অন্যদিকে সেই একই পবিত্র নগরী থেকে তাঁর নিজ উম্মত, অর্থাৎ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপরও শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, সেহেতু জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্র বা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাঁর জন্য অপরিহার্য হবে।

এমতাবস্থায়, নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের সাথে মসীহের সম্পর্ক কেমন হবে?

আমরা প্রথমেই যে বিষয়টি জানতে পারি, তা হলো মসীহের সাথে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের সম্পর্কের বিষয়টিই একজন ইমাম ও খলিফার আগমনের কারণ ব্যাখ্যা

করে, যিনি ইমাম আল-মাহদী নামে পরিচিত হবেন। নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের উপর তাঁর শাসন আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রতিষ্ঠিত হবে, ঠিক মসীহ ফিরে আসার আগ মুহূর্তে। প্রকৃতপক্ষে, পাঠক শীঘ্রই জানতে পারবে যে, এই বিষয়টিই ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাকে তার সর্বোচ্চ মহিমায় প্রকাশ করে।

মসীহ ও ইমাম আল-মাহদী

যদিও মসীহ ফিরে আসবেন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে, নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের কাছে নয়, তবুও তাঁকে নবীর অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক রাখতেই হবে। কারণ, নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মত এবং মসীহের উম্মত দুটিই একই ইসলাম ধর্মের অধীনে থাকবে। আর মহান আল্লাহ তাঁকে কুরআন শিখিয়েছেন, তারপর জ্ঞান দিয়েছেন, এবং তারপর তাঁর নিজের উম্মতের কিতাব, অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজিল শিখিয়েছেন, কারণ, তাঁকে দুটি সম্প্রদায়কেই (অর্থাৎ দুটি উম্মতকেই) পথ দেখাতে হবে।

মুসলিম বিশ্ব যখন অবৈধভাবে অসংখ্য রাজতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকবে, তখন তিনি এই কাজটি করতে পারবেন না। বরং, মসীহকে এমন এক মুসলিম বিশ্বে ফিরে আসতে হবে, যা মক্কাকে রাজধানী করে একজন বৈধ খলিফার অধীনে একটি একক খিলাফত রাষ্ট্র হিসেবে পুনরায় এক হয়েছে। আর এটাই মসীহের জন্য জেরুজালেমে একই কাজ করার পথ খুলে দেবে এবং তা সহজ করে দেবে।

কাজেই, এটা পরিষ্কার যে, দুঃখজনকভাবে বিভক্ত এই মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না, যারা নিজেদের মধ্যে ঐক্য ফেরাতে কখনোই পারবে না এবং যারা রাষ্ট্র চালানোর ব্যাপারে সব সময়ই কুরআনের নির্দেশনা মানতে অস্বীকার করেছে।
প্রকৃতপক্ষে, কুরআন এবং পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের জ্ঞানেও যে তাদের ঘাটতি থাকবে, তা প্রায় নিশ্চিত। সম্মানিত পাঠক এখন সেই ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের পেছনের প্রজ্ঞা ও যৌক্তিকতা আরও
ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন, যা নিশ্চিত করবে যে, মসীহ ফিরে আসার সেই সংকটময় মুহূর্তে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মত একজন বৈধ নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হবে।

সেই নেতা দারুল উলূম থেকে প্রাপ্ত ত্রুটিপূর্ণ ও পথভ্রষ্ট শিক্ষা অথবা প্রচলিত রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রজ্ঞার পরিবর্তে, কুরআনে নিহিত ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসারে নেতৃত্ব দেবেন।
আর ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই নবী মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর বংশ থেকে আল-মাহদী নামে পরিচিত একজন ইমামের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যিনি মসীহের (আঃ) প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতিস্বরূপ নবীর উম্মতের অবশিষ্ট অংশের উপর তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন:

আবূ হুরাইরা (রাযি.) নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন:

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟

"তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মধ্যে মারইয়াম পুত্র 'ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে"

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৫

নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এটাই নির্দেশ করে যে, তাঁর জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠিত সেই বৈধ খিলাফত রাষ্ট্র বা পবিত্র রাষ্ট্রটি মসীহ (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।
তিনি আরো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, সেই সময়ে যিনি ইমাম বা খলিফা হিসেবে মুসলিমদের উপর শাসন করবেন, তিনি হবেন তাঁরই বংশধর এবং তিনি 'আল-মাহদী' নামে পরিচিত হবেন:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَهْدِيُّ مِنِّي، أَجْلَى الْجَبْهَةِ، أَقْنَى الْأَنْفِ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ
আমার বংশ থেকে মাহদীর আবির্ভাব হবে, সে হবে প্রশস্ত ললাট ও উন্নত নাকবিশিষ্ট।

তখনকার দুনিয়া যেরূপে যুলুমে ভরে যাবে, সে তার বিপরীতে তা ইনসাফে ভরে দিবে, আর সে সাত বছর রাজত্ব করবে।

সুনান আবু দাউদ, হাদীস ৪২৮৫

যেহেতু মহানবী (ﷺ) তাঁর বংশ থেকে এমন একজন ইমামের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যিনি মসীহের প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতিস্বরূপ ইসলামী বিশ্বের উপর শাসন করবেন, সেহেতু আমরা
সঠিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তিনি সেই সময়ে মক্কাকে রাজধানী করে একটি খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। তবে, নবী (ﷺ) আরো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, মসীহও একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হবেন; সুতরাং, এর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু মসীহকে আহলে কিতাব ছাড়া অন্য কারো প্রতি প্রেরণ করা হবে না, সেহেতু তাঁকেও জেরুজালেমকে রাজধানী করে তাঁর নিজস্ব খিলাফত বা পবিত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর তখন বিশ্ববাসী দুটি খিলাফত রাষ্ট্র বা পবিত্র রাষ্ট্রকে পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখবে। এদের মধ্যে একটি পরিচালিত হবে কুরআনে অবতীর্ণ শরীয়ত বা আইন অনুসারে, এবং অন্যটি তাওরাত ও ইনজিলে অবতীর্ণ আইন অনুসারে।

আমাদের পাঠকগণ সহজেই অনুমান করতে পারছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন খিলাফত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত বা পবিত্র আইন অনুসরণকারীদের জন্য কী ধরনের সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উভয় রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করে এমন বিষয়গুলোতে কোন আইনটি অগ্রাধিকার পাবে?
আমরা এখন সেই ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাকে কার্যকর হতে দেখতে পাচ্ছি, যখন আল্লাহ মসীহকে কেবল তাওরাত ও ইনজিলই নয়, বরং কুরআনও শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁকে এমন প্রজ্ঞা দান করেছিলেন, যা দ্বারা তিনি এই দুই আইন ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন:

... وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ...

"...এবং (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত (বিশেষ প্রজ্ঞা), তাওরাত এবং ইনজিল শিক্ষা দিয়েছিলাম..."

সূরা আল-মায়িদাহ ৫:১১০

কুরআনের উপরের আয়াত থেকে পাঠকদের এটা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, আল্লাহর পরিকল্পনায় ইমাম আল-মাহদীর পরিবর্তে মসীহেরই কাজ হবে সেইসব বিষয়ে সর্বোচ্চ পথপ্রদর্শক এবং সর্বোচ্চ বিচারক হওয়া, যেগুলোতে দুটি সম্প্রদায়েরই নির্দেশনা ও আইনি সিদ্ধান্তের দরকার হবে।

দামেস্কের এক মাসজিদে মসীহের নাটকীয় অবতরণ

এখন আমরা সেই প্রকৃত ঘটনাটির দিকে দৃষ্টিপাত করছি, যা এই পৃথিবীতে মসীহ (আঃ)এর প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী হবে। নবী মুহাম্মদ (ﷺ), যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, মসীহ আকাশ থেকে দুইজন ফেরেশতার ডানার উপর হাত রেখে অবতরণ করবেন এবং তিনি দামেস্কের একটি মাসজিদে অবতরণ করবেন। এমনকি আমাদের কাছে তাঁর পোশাকের রঙ এবং শারীরিক অবয়বেরও বিবরণ রয়েছে। তিনি মাসজিদে ঠিক তখনই নামবেন, যখন ইমাম আল-মাহদী জামা'আতের নামায পড়ানোর জন্য দাঁড়াবেন:

إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ ... بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ ...

"ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ মরিয়ম-পুত্র মসীহকে প্রেরণ করবেন। আর তিনি দামেস্কের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শ্বেতশুভ্র মিনারের নিকট অবতরণ করবেন—দুটি হালকা জাফরানি রঙের পোশাক পরিহিত অবস্থায়, দুজন ফেরেশতার ডানার উপর তাঁর হাত রেখে। তিনি যখন মাথা নত করবেন, তখন (ঘামের) ফোঁটা ঝরবে, আর যখন মাথা তুলবেন, তখন তা থেকে মুক্তার মতো উজ্জ্বল বিন্দু গড়িয়ে পড়বে। আর এমন কোনো কাফির থাকবে না, যে তাঁর নিঃশ্বাসের গন্ধ পাবে আর জীবিত থাকবে; বরং সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে। তাঁর দৃষ্টি যতদূর যাবে, তাঁর নিঃশ্বাসও ততদূর পৌঁছাবে। অতঃপর তিনি তাকে (দাজ্জালকে) খুঁজতে থাকবেন"

সহীহ মুসলিম

এখন আমরা জানতে পারলাম যে, মসীহ (আঃ) ফিরে আসার পর সর্বপ্রথম যে ঘটনাটি ঘটবে তা হলো তাঁর নিঃশ্বাস ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে, যতদূর তাঁর দৃষ্টি যায়, এবং তাঁর

নিঃশ্বাস যে কোনো অবিশ্বাসীর নিকট পৌঁছানো মাত্রই তার মৃত্যু ঘটাবে। তবে, কাফির বা অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য, অবশ্যই তাওরাত, ইনজিল এবং কুরআনে অবতীর্ণ সত্য জেনে-বুঝে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কারণ এগুলোই হলো সর্বশেষ অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ। আর একারণেই, তারা ঈসা (আঃ)-কে মসীহ হিসেবে এবং মুহাম্মদ (ﷺ)-কে আল্লাহর সর্বশেষ নবী হিসেবেও প্রত্যাখ্যান করেছে (তাঁদের উভয়ের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)।

ইমাম আল-মাহদী মসীহকে ঠিক সেইভাবে চিনবেন, যেমনভাবে ইয়াহইয়া (আঃ) প্রথমবার মসীহকে চিনেছিলেন। অতএব, মাসজিদে মসীহের অবতরণের প্রাথমিক অর্থ হলো মসীহকে সঠিকভাবে এবং স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা। মহান আল্লাহ এই বিষয়টি কখনোই অনিশ্চয়তার ওপর ছেড়ে দেননি। বরং, দুটি ক্ষেত্রে তিনি এমন একজনকে প্রেরণ করেছেন, যার মূল দায়িত্বই ছিল মসীহকে সনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।

ইমাম আল-মাহদী তখন মসীহকে জামা'আতের নামায পড়ানোর জন্য অনুরোধ করবেন।

যদি মসীহকে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের একজন সদস্য বা 'উম্মতী' হিসেবে ফেরত পাঠানো হতো, তবে শরীয়ত অনুযায়ী তিনি ইমামের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকতেন এবং ইমাম আল-মাহদীকে তাঁর পেছনে রেখে নামায পড়াতেন। (কারণ, শরীয়তের নিয়ম হলো, একজন নবী উপস্থিত থাকলে তিনিই নামাযের ইমামতি করবেন, যদি না তিনি অসুস্থ হন)। আর এমনটি ঘটলে, এর সোজা অর্থ দাঁড়াত যে, মসীহ তখন আপনা আপনিই নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের খলিফা বা নেতা হয়ে যেতেন। কিন্তু, নবী মুহাম্মদ (ﷺ) আমাদের বলেছেন যে, মসীহ সেই অনুরোধ ফিরিয়ে দেবেন এবং ইমামকেই নামায পড়াতে বলবেন:

فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا . فَيَقُولُ لاَ . إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ . تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةَ .

"...অতঃপর মরিয়ম-পুত্র ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। তখন তাদের আমীর (নেতা) বলবেন, 'আসুন, আমাদের সালাতে নেতৃত্ব দিন।' তিনি বলবেন, 'না। নিশ্চয়ই

তোমাদেরই একজন অন্যজনের উপর নেতা।' (তিনি এই কথা বলবেন) এই উম্মতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া মর্যাদার কারণেই।"

সহীহ মুসলিম

পাঠকরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, কেন মসীহ (আঃ) ইমামের নামায পড়ানোর অনুরোধটি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, তিনি যদি সেই অনুরোধ গ্রহণ করতেন এবং ইমামকে পেছনে নিয়ে নামায পড়াতেন, তাহলে কুরআনের শরীয়ত অনুযায়ী, তিনি সাথে সাথেই নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের 'আমীর' বা নেতা হয়ে যেতেন। আর এমনটি করলে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য নির্ধারিত সেই বিশেষ ভূমিকারই লঙ্ঘন করতেন, যে ভূমিকা তাঁকে নেতা হিসেবে কেবল বনী ইসরাঈল, অর্থাৎ আহলে কিতাবের (ইহুদি ও খ্রিস্টানদের) মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল যারা তাঁর ফিরে আসার পর তাঁকে অনুসরণ করবে।

যে অজ্ঞ ব্যক্তি দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বলে যে, মসীহের পদমর্যাদা কমে যাবে এবং তিনি একজন 'নবী' হিসেবে ফিরে আসবেন না, তার উচিত কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে এই মিথ্যার জবাব দেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা।

ইমামের নেতৃত্বে নামাজে মসীহের অংশগ্রহণের তাৎপর্য

অতঃপর মসীহ (আঃ) ইমামের নেতৃত্বে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য কাতারভুক্ত হবেন। এই ঘটনাটি থেকে নিম্নলিখিত তাৎপর্যগুলো উন্মোচিত হবে:

প্রথমত, মসীহকে কোনো গির্জা, ক্যাথেড্রাল বা সিনাগগের পরিবর্তে, জামা'আতের সালাতের সময় একটি মাসজিদে অবতরণের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে, ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা তাঁর আগমনের প্রথম মুহূর্ত থেকেই এমন এক মহানাটকীয় মঞ্চ প্রস্তুত করেছে, যেখানে মসীহ তাঁর নিজ অনুসারীদের প্রতি মনোনিবেশ করার পূর্বেই, নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মগজধোলাইকৃত উম্মতের মুখোমুখি হবেন।

তাঁর নিজ উম্মত ব্যতীত অন্য এক উম্মতের সাথে এই সংযোগ স্থাপনই হবে তাঁর মিশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি, এবং আল্লাহর বিধান এই যে, তিনি তাঁর আগমনের প্রথম মুহূর্ত থেকেই এই কঠিন কাজটি মোকাবেলা করা শুরু করবেন।

নবী মুহাম্মদ (ﷺ) তো এমন এক সময়ের ব্যাপারে সতর্কই করেছিলেন, যখন ইসলামের কেবল নামটিই অবশিষ্ট থাকবে; সুতরাং, এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে, মসীহকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর মিশন শুরুই করতে হবে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসারীদেরকে নিয়ে:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ، وَفِيهِمْ تَعُودُ

"শীঘ্রই মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে,যখন ইসলামের কেবল নামটুকুই অবশিষ্ট থাকবে,
আর কুরআনের থাকবে শুধু অক্ষরমাত্র (লেখা থাকবে, হিদায়াত থাকবে না)।তাদের মসজিদগুলো হবে বাহ্যিকভাবে জাঁকজমকপূর্ণ ও জনাকীর্ণ, কিন্তু হবে হিদায়াত ও সত্য-নেতৃত্বশূন্য একটি ওয়ীরান অবস্থা। তাদের আলেমরা হবে আকাশের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি; তাদের থেকেই ফিতনার সূচনা হবে, এবং তাদের মাঝেই তা ফিরে আসবে।"

সুনানে বায়হাকি

খ্রিস্টান পাঠকরা এটা জেনে অবাক হবেন যে, মসীহকে পথভ্রষ্ট মুসলিমদেরকে কী কী বিষয় শেখাতে হবে। যেমন, তাঁকে বোঝাতে হবে যে, তিনি এখনও একজন 'নবী', আর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাঁর নবুয়ত বাতিল করতে পারে না। তাঁকে খুব স্পষ্টভাবে এও ঘোষণা করতে হবে যে, তাঁকে তাদের (মুসলিমদের) কাছে পাঠানো হয়নি; বরং, আল্লাহ তাঁকে তাঁর নিজের অনুসারীদের কাছেই ফেরত পাঠিয়েছেন। কাজেই, পথভ্রষ্ট মুসলিমদের এটা মেনে নিতেই হবে যে, তিনি নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের সদস্য নন।

দ্বিতীয়ত, নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ শরীয়ত অনুসারে পরিচালিত একটি মাসজিদে সালাত বা জামা'আতের নামাযে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, মসীহ (আঃ) তাঁর নিজ অনুসারীদের নিকট এই বার্তা প্রেরণ করবেন যে, কুরআন হলো সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহরই অবতীর্ণ বাণী, এবং একারণেই, পরম সত্য কুরআনের মধ্যেই নিহিত

রয়েছে। এটি তাঁর অনুসারীদের নিকট এও সুনিশ্চিত করবে যে, নবী মুহাম্মদ (ﷺ) প্রকৃতপক্ষে সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহরই প্রেরিত নবী।

তৃতীয়ত, ইমাম আল-মাহদীর পেছনে জামা'আতের নামাযে অংশ নিয়ে যখন তিনি প্রমাণ করবেন যে, কুরআন সত্যিই সেই এক আল্লাহরই নাযিল করা বাণী, তখন তাঁর অনুসারীদের কাছে এই বার্তাটিই যাবে যে, কুরআন তাঁর সম্পর্কে যা যা বলেছে, সবই সত্য। আর একারণেই, খ্রিস্টানদের 'এক ঈশ্বরে তিনজন' (Triune God) এবং মসীহকে 'ঈশ্বরের পুত্র' ভাবার বিশ্বাসটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে; আর সেই সাথে, তাঁকে যে ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল এই বিশ্বাসটিও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।

চতুর্থত, মসীহ (আঃ) যখন নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসারীদের সাথে থাকবেন, তখন তিনি কুরআনের শরীয়ত অনুযায়ী মক্কার দিকে ফিরে তাদের সাথে নামায পড়বেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁর নিজের অনুসারীদের সাথে থাকবেন, তখন তিনি তাওরাত ও ইনজিলের পুরনো আইন অনুযায়ী জেরুজালেমের দিকে ফিরে নামায পড়বেন। কাজেই, মসীহের এই কাজের সাথে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর একটি কাজের গভীর মিল থাকবে। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছিলেন, তখন তিনি সেখানকার ইহুদিদের সাথে তাদের তাওরাতের নিয়ম অনুযায়ী সতেরো মাস রোজা রেখেছিলেন। তিনি সেই সতেরো মাস তাদের কিবলা, অর্থাৎ জেরুজালেমের দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন, যদিও তিনি তাঁর নিজের উপর নাযিল হওয়া শরীয়ত অনুযায়ীই নামায পড়তেন। ঠিক তেমনি, মসীহও তাঁর নিজের শরীয়ত চালু করার প্রস্তুতির সময়, তাঁর পাশাপাশি চলা আরেকটি শরীয়তের বৈধতাকেও স্বীকার করে নেবেন।

আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো এই কারণেই করছি যে,অনেক মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, ঈসা (আঃ)-কে বনী ইসরাঈল জাতির কাছে ফেরত পাঠানো হবে না; বরং, আল্লাহ তাঁকে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের একজন সদস্য হিসেবেই ফেরত পাঠাবেন। যারা এই মতটি ধারণ করেন, তারা সম্ভবত এমন কিছু হাদীসের কারণে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ (ﷺ) উম্মতের শুরুতে, ঈসা (আঃ) শেষে, এবং ইমাম আল-মাহদী তাঁদের দুজনের মাঝে থাকবেন।
এই লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, ইতিহাসের শেষে একটিই মাত্র ‘দ্বীন’ বা ধর্ম থাকবে। আর এর ফলে, তারা ভুলভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে, ইতিহাসের শেষে একটিই মাত্র ‘উম্মত’ বা ধর্মীয় সম্প্রদায় টিকে থাকবে।

এটা প্রকৃতপক্ষে সঠিক যে, ইতিহাস কেবল একটি 'মিল্লাত' বা সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা দ্বারাই সমাপ্ত হবে, এবং তা হবে ইসলামেরই জীবনব্যবস্থা, অর্থাৎ প্রভু-প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) তেমনই ঘোষণা করেছেন:

... وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِسْلاَمَ ...

"মসীহ ফিরে আসার সময় আল্লাহ ইসলাম ছাড়া বাকি সব ধরনের জীবনব্যবস্থাকে (ধর্মীয় হোক বা না হোক) শেষ করে দেবেন; অর্থাৎ, (টিকে থাকবে শুধু) তাদেরই জীবনব্যবস্থা, যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে।"

সুনানে আবু দাউদ

বস্তুত,পবিত্র কুরআন তিনবার এই ঘোষণা দিয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম অর্থাৎ, প্রভু-প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণের ধর্ম অবশেষে তার সকল প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদের উপর অবশ্যই বিজয়ী হবে:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(কুরআন, আত-তাওবাহ, ৯:৩৩; আরও দেখুন আল-ফাতহ, ৪৮:২৮, এবং আস-সফ, ৬১:৯)

যদিও আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ইতিহাসের শেষে একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে কেবল সত্য ধর্মই টিকে থাকবে, কিন্তু তিনি কখনোই এই কথা বলেননি যে, মসীহ ফিরে আসার সময় সেই সত্য ধর্মের ভেতরে একটিই মাত্র 'উম্মত' বা ধর্মীয় সম্প্রদায় থাকবে

মসীহ কি নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের একজন সদস্য হিসেবে প্রত্যাবর্তন করবেন?

অনেক মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, ইতিহাসের শেষে যে একমাত্র সত্য ধর্ম, অর্থাৎ ইসলাম, বিজয়ী হবে, তাতে শুধুমাত্র মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতই অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে, আর কেউ নয়। আর একারণেই, তারা মনে করেন যে, মসীহ যখন ফিরে আসবেন, তখন পৃথিবীতে একটিই মাত্র উম্মত থাকবে।

আমরা এখন কুরআন থেকে যে প্রমাণ তুলে ধরছি, তা পরিষ্কার করে দেয় যে, এই ধারণাটি ভুল।

যদি ঈসা (আঃ)-কে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের একজন সদস্য হিসেবে প্রত্যাবর্তন করতে হতো, তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী তাৎপর্য দাঁড়াতো এই যে, তাঁকে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর একজন অনুসারী হতে হবে। তদুপরি, যারা ঈসাকে অনুসরণ করেন, তাদের সকলকেও নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসারী হতে হবে, এবং তারা আর মসীহের অনুসারী থাকবেন না, যার উম্মতের অস্তিত্বই তখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

যদি মসীহের উম্মতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে তাঁর কোনো অনুসারীই থাকবে না; কিন্তু এমনটি কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হবে, যার কয়েকটি এই গ্রন্থেই পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত, ঈসা (আঃ) যদি নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের সদস্য হিসেবে ফিরে আসতেন, তাহলে এর মানে হতো, তাওরাত ও ইনজিলের শরীয়ত বা আইন বাতিল হয়ে যাবে। এমনটা হতো কারণ, তখন একটিই মাত্র উম্মত থাকবে, আর তাই ইতিহাসের শেষে একটিই মাত্র শরীয়ত কার্যকর থাকবে, আর তা হলো কুরআনের শরীয়ত।

কিন্তু যদি তাই সত্য হয়, তবে আল্লাহ কেন ঈসা (আঃ)-কে প্রথমে কুরআন শিক্ষা দিলেন, অতঃপর তাঁকে প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তারপর তাওরাত ও ইনজিলও শিক্ষা দিলেন?

... وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ...

"...এবং (স্মরণ করো,) যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত (বিশেষ প্রজ্ঞা), তাওরাত এবং ইনজিল শিক্ষা দিয়েছিলাম..."

সূরা আল-মায়িদাহ ৫:১১০

আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈসা (আঃ)-কে একদিকে কুরআন এবং অন্যদিকে তাওরাত ও ইনজিল শেখানো এবং এর মাঝে তাঁকে জ্ঞান দান করার একটিই মাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা হতে পারে। আর তা হলো যখন তিনি ফিরে আসবেন, তখন তাঁর এই তিনটি কিতাবেরই জ্ঞানের দরকার হবে। আর দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করার সময় সেই জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য তাঁর প্রজ্ঞারও প্রয়োজন হবে। সুতরাং, যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন এমন একটি উম্মত থাকবে, যা তাওরাত ও ইনজিল অনুসরণ করবে যার নেতৃত্ব তিনি দেবেন; এবং আরেকটি উম্মত থাকবে, যা কুরআন অনুসরণ করবে এবং যার নেতৃত্ব দেবেন ইমাম আল-মাহদী। আর মসীহ হবেন সর্বোচ্চ পথপ্রদর্শক, শিক্ষক এবং প্রতিটি সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিষয়াবলীতে চূড়ান্ত আইনগত কর্তৃপক্ষ।
আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রজ্ঞা ব্যতীত এই ভূমিকা পালন করা অসম্ভব। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটির এর চেয়ে ভিন্ন কোনো যৌক্তিক ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে না।

আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে ঈসা (আঃ)-কে কেন্দ্র করেই, যেখানে তিনি নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে অনুসরণকারী মুসলিমদের জন্য এবং সেই সাথে তাঁর নিজ অনুসারীদের জন্যও সর্বোচ্চ পথপ্রদর্শক, চূড়ান্ত আইনগত কর্তৃপক্ষ এবং পরম আধ্যাত্মিক অভিভাবক হিসেবে অধিষ্ঠিত হবেন।

দ্বিতীয়ত, কুরআন এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, মসীহের নিজস্ব উম্মত পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত থাকবে। কারণ, এমন লোক থাকবেই, যারা শেষ পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করবে:

... وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ...

"...এবং (হে ঈসা,) যারা তোমাকে অনুসরণ করে, আমি তাদেরকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কাফিরদের (অস্বীকারকারীদের) উপর বিজয়ী করে রাখব..."

সূরা আল-ইমরান, আয়াত ৫৫

কুরআনের উপরের আয়াতটি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে পৃথিবীতে এক বিজয়ী অবস্থানে তুলে আনবেন; আর যখন এমনটি হবে, তখন তারা পৃথিবীর শেষ পর্যন্তই সেই বিজয়ী অবস্থানে থাকবে।কাজেই, এই ধারণা যে তাদেরকে তাদের নিজেদের উম্মত ছেড়ে দিয়ে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতে যোগ দিতে হবে, তা কুরআনের কথার সাথে সরাসরি সংঘাতে লিপ্ত, আর তাই এটি মিথ্যা।

তৃতীয়ত, কুরআন পরিষ্কারভাবে বলেছে যে, 'আহলে কিতাব' নামে পরিচিত একটি জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত 'আহলে কিতাব'ই থাকবে, যতক্ষণ ঈসা (আঃ) জীবিত থাকবেন। কারণ, তাঁর, অর্থাৎ ঈসার, মৃত্যুর আগেই তাদের সবাইকে তাঁকে মসীহ হিসেবে মেনে নিতে হবে। যদি ঈসা ফিরে আসার সময়, তাদেরকে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের সদস্য হতে বাধ্য করা হয়, তবে এটা স্পষ্ট যে, তখন আর তাদেরকে 'আহলে কিতাব' বলা যাবে না:

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

"আর আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কেউই থাকবে না, যে তাঁর (ঈসার) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর ঈমান আনবে না; এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।"

সূরা আন-নিসা ৪:১৫৯

কুরআনের উপরের আয়াতটি পরিষ্কারভাবে আমাদের জানিয়েছে যে, মসীহ যখন ফিরে আসবেন, তখন পৃথিবীতে আহলে কিতাব, অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা থাকবে। আর তাঁর (মসীহের) মৃত্যুর আগেই তাদের সবাইকে তাঁর উপর ঈমান আনতে হবে। কাজেই, যতক্ষণ তিনি জীবিত থাকবেন, ততক্ষণ পৃথিবীতে আহলে কিতাবের এমন কিছু লোক থাকার সম্ভাবনা, যাদেরকে তাঁকে মসীহ হিসেবে মেনে নিতে হবে। আর যখন তারা তাঁকে মসীহ হিসেবে মেনে নেবে, তখন তাদের অবশ্যই তাঁর উপর বিশ্বাস আনতে হবে এবং তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে। কুরআন কখনোই বলেনি যে, তারা মসীহের উপর বিশ্বাস আনবে, কিন্তু অনুসরণ করবে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে।

চতুর্থত, কুরআন পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে যে, মহান আল্লাহ 'দ্বীন' বা ইসলাম ধর্মের ভেতরেই বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় (উম্মত) তৈরি করেছেন। তিনি কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পরিষ্কারভাবে এও বলেছেন যে, তিনি যদি চাইতেন, তবে সকল মানুষকে একটিই উম্মত বানাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি! কাজেই, মসীহ ফিরে আসার সময় একটিই মাত্র উম্মত থাকবে
এই ধারণাটির পরিবর্তে, মসীহের উম্মত আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার আলাদা পরিচয় ধরে রাখবে:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"...আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি আইন (শরীয়ত) ও একটি স্পষ্ট পথ (মিনহাজ) ঠিক করে দিয়েছি। আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে একটিই উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই, তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতে, সে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।"

সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত ৪৮

কুরআনের আরও কিছু আয়াত নিচে দেওয়া হলো, যেগুলো বলে যে, মহান আল্লাহ চাইলে সব মানুষকে একটিই উম্মত বা ধর্মীয় সম্প্রদায় বানিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

"আর তোমার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি সকল মানুষকে একটি একক উম্মতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু তারা সর্বদাই মতভেদ করতে থাকবে।"

সূরা হুদ, আয়াত ১১৮।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি তোমাদের সকলকেই একটি একক উম্মতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তোমরা যা করতে, সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত করা হবে।"

সূরা আন-নাহল, আয়াত ৯৩

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

"আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি তাদের সকলকেই একটি একক উম্মতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতের (অনুগ্রহের) অন্তর্ভুক্ত করেন। আর যালিমদের জন্য কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই।"

সূরা আশ-শূরা, আয়াত ৮

কুরআন এমনকি এও বলেছে যে, আল্লাহ যদি কাফিরদেরকে রুপার ছাদওয়ালা বাড়ি ইত্যাদি দিতেন, তাহলে হয়তো সব মানুষই একটি উম্মতে পরিণত হয়ে যেত। কিন্তু তিনি ঠিক এই কারণেই তা করেননি, কারণ তিনি চাননি যে তারা সবাই এক উম্মত হয়ে যাক:

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

"আর যদি এই আশঙ্কা না থাকত যে, সকল মানুষ (ধনের লোভে) একই (অবিশ্বাসী) উম্মতে পরিণত হয়ে যাবে, তবে যারা দয়াময় (আল্লাহ)-কে অস্বীকার করে, আমি তাদের গৃহের জন্য রুপার ছাদ এবং সিঁড়ি বানিয়ে দিতাম, যা দিয়ে তারা উপরে আরোহণ করত।"

সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত ৩৩

উপরিউক্ত আয়াতটির তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট, এবং তা নিম্নরূপ: যেহেতু সমগ্র মানবজাতি এক উম্মতে পরিণত হোক এটা আল্লাহর ইচ্ছা নয়, সেহেতু তিনি অবিশ্বাসীদেরকে রুপার ছাদ ও সিঁড়ি প্রদান করবেন না।

পঞ্চমত, হাওয়ারীগণ (শিষ্যরা) মসীহকে আল্লাহর নিকট এই আরজি জানাতে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি যেন তাদের জন্য রান্না করা খাবারে পরিপূর্ণ একটি দস্তরখান প্রেরণ করেন; তারা এই অনুরোধটি করেছিল, যাতে এটি তাদের প্রতি তাঁর বার্তার সত্যতা সুনিশ্চিত করতে পারে।
এই বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, পবিত্র কুরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ সূরার নামকরণই করা হয়েছে 'সূরা আল-মায়েদাহ'।

মসীহ তাদের সেই অনুরোধের জবাবে প্রভু-প্রতিপালকের নিকট একটি দোয়া করেছিলেন, যা কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে:

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"মরিয়ম-পুত্র ঈসা দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান থেকে একটি (খাবার ভর্তি) দস্তরখান অবতীর্ণ করুন, যা আমাদের জন্য—আমাদের প্রথম ও শেষ সকলের জন্য—একটি আনন্দোৎসব (ঈদ) হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান করুন, আর আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা'।"

সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত ১১৪

পাঠকদেরকে ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, সেই সময়ে কেবল মসীহের অনুসারীরাই এই উৎসবটি পালন করত; কাজেই, কুরআনের আয়াতে 'আমাদের প্রথম' বলতে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) কখনোই এই উৎসব পালন করেননি। আর একারণেই, কোনো মুসলিম যদি তা পালন করতে যায়, তবে তা 'বিদ'আত' হবে। কাজেই, এটা বোঝা উচিত যে, মুসলিমরা সেই 'আমাদের শেষ' হতে পারে না, যারা, কুরআন অনুযায়ী, মসীহ ফিরে আসার পর সেই উৎসবটি পালন করবে।

আমাদের উপসংহার হলো, কুরআনের উপরের আয়াতটি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, মসীহ যখন ফিরে আসবেন, তখন তাঁর এমন কিছু অনুসারী থাকবেন, যারা এমন একটি উৎসব পালন করবেন, যা নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসারীদের জন্য পালন করা নিষিদ্ধ।

কাজেই, মসীহের এমন অনুসারী থাকবেন, যারা নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের অংশ হবেন না।

পরিশেষে, পবিত্র কুরআন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, এমন কিছু ইহুদি ও খ্রিস্টান থাকবেন, যারা পরিশেষে কুরআনকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কালাম হিসেবে মেনে নেবেন এবং ফলস্বরূপ মুহাম্মদ (ﷺ)-কে তাঁর রাসূল হিসেবেও গ্রহণ করবেন, এবং তথাপি আহলে কিতাব হিসেবেই তাদের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"আর নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (কুরআন) ও যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল (তাওরাত ও ইনজিল), তার প্রতিও (ঈমান আনে)। আল্লাহ্‌র সম্মুখে তারা বিনীত। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে না। তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।"

সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৯

উপরের আয়াতটি এটাই বোঝায় যে, মসীহকে অনুসরণকারীরা একটি আলাদা সম্প্রদায় হিসেবেই টিকে থাকবে এমনকি তারা কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর বিশ্বাস আনার পরেও।
কাজেই, মসীহ যখন ফিরে আসবেন, তখন এমন একটি উম্মত থাকবে, যারা ইসলাম ধর্মের ভেতরে থেকেই তাঁকে অনুসরণ করবে, আর তাদেরকে শেষ উম্মতে যোগ দিতে হবে না।

আয়াতটি যখন বহুবচন রূপে 'তোমাদের' শব্দটি ব্যবহার করে, তখন তা আরও গভীর তথ্য বহন করে। এর তাৎপর্য এই যে, আয়াতটি সেই নবীকে সম্বোধন করছে না, যার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। বরং, এটি সেই সম্প্রদায়কে সম্বোধন করছে, যারা তাঁকে অনুসরণ করে;

সুতরাং, এটি এমন এক ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, যখন আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের একদল লোক কুরআনকে প্রভু-প্রতিপালকের কালাম হিসেবে মেনে নেবে এবং ফলস্বরূপ মুহাম্মদ (ﷺ)-কে তাঁর নবী হিসেবেও গ্রহণ করবে, এবং তথাপি আহলে কিতাব হিসেবেই (তাদের পরিচয়) অক্ষুণ্ণ থাকবে।

কুরআন থেকে উপরে উপস্থাপিত এই বিপুল ও অকাট্য প্রমাণ, বহু মগজধোলাইকৃত মুসলিমদের সেই বিশ্বাসকে সফলভাবে খণ্ডন করেছে যে, ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে একটিই মাত্র উম্মত থাকবে এবং ঈসা (আঃ) নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতের একজন সদস্য হিসেবেই প্রত্যাবর্তন করবেন।

এই লেখক তাদের জন্য এক কঠোর সতর্কবার্তা উচ্চারণ করছেন, যারা এই বিশ্বাসকে একগুঁয়েভাবে আঁকড়ে ধরে থাকেন যে, মসীহের প্রত্যাবর্তনের সময় পৃথিবীতে একটিই মাত্র উম্মত বিদ্যমান থাকবে। (তাদের প্রতি) হুঁশিয়ারি এই যে, আল্লাহ যখন কুরআনে কোনো কিছু দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, তখন তা প্রত্যাখ্যান করা 'কুফর' বা অবিশ্বাসেরই শামিল হবে।

এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে পৃথিবীতে রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে সম্মিলিতভাবে দুটিই মাত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় (অর্থাৎ, দুটি উম্মত) বিদ্যমান থাকবে, এবং উভয়ই ইসলাম 'দ্বীন' বা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা হলো প্রভু-প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণের ধর্ম।
এই উম্মতগুলোর প্রত্যেকেরই নিজস্ব 'কিবলা' থাকবে, অর্থাৎ, যে দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে হয়। প্রথম উম্মতটির নেতৃত্ব দেবেন মসীহ, এবং তারা তাদের কিবলা, অর্থাৎ জেরুজালেমের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে।

কুরআন নিশ্চিত করে যে, জেরুজালেমের কিবলা সেই উম্মতের জন্য বাতিল বা রহিত করা হয়নি, যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল:

... وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ...

"...আর আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন, এবং তারাও একে অপরের কিবলার অনুসারী নয়..."

সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৪৫

দ্বিতীয় উম্মতটির নেতৃত্ব দেবেন ইমাম আল-মাহদী এবং তারা মক্কার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে।

অন্যান্য সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় স্বতন্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে সম্মিলিতভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
সেই সময়ে যদি পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধধর্মের মতো এমন কোনো ধর্ম বিদ্যমান থাকে, যাদের ধর্মগ্রন্থে কোনো সত্য নিহিত আছে, তবে সেই সত্যই তাদেরকে মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থসমূহ তাওরাত, ইনজিল এবং কুরআনে অবস্থিত চূড়ান্ত সত্যের দিকে পরিচালিত করবে, যার প্রতি তাদেরকে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতে হবে।
আর যদি তারা তা না করে, তবে তারা একটি সম্মিলিত ধর্মীয় সম্প্রদায় বা রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না।

প্রকৃত মসীহের সাথে ভণ্ড মসীহের মোকাবিলা

নবী মুহাম্মদ (ﷺ) আরও জানিয়েছেন যে,সালাত শেষ হওয়া মাত্রই মসীহ মাসজিদের ফটক বা প্রতিবন্ধকতাগুলো খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেবেন, এবং সেগুলো খোলা মাত্রই ভণ্ড মসীহ দাজ্জাল বা অ্যান্টিক্রাইস্টকে মাসজিদের বাইরে দেখা যাবে। তার সাথে ইসফাহানের সত্তর হাজার ইহুদি অনুসারী থাকবে। যেহেতু উপরিউক্ত হাদীসটি দামেস্কের মাসজিদটিকে প্রতিবন্ধক দ্বারা বেষ্টিত হিসেবে বর্ণনা করেছে, সেহেতু এর একটি সম্ভাব্য তাৎপর্য হতে পারে এই যে, সিরিয়ার সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়তো মসীহ (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত শেষ হবে না।

এখন আমরা এমন নতুন তথ্য জানতে পারছি যা ব্যাখ্যা করে: কেন মসীহকে ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ থেকে অবতরণ করানো হলো? কেন তিনি দামেস্কে অবতরণ করলেন? আর কেনই বা একটি মাসজিদে? এর কারণ হবে এই যে, তথাকথিত পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্র, যার নেতৃত্বে থাকবে ভণ্ড মসীহ দাজ্জাল বা অ্যান্টিক্রাইস্ট, তখন সিরিয়ার উপর এক বিশাল সামরিক আগ্রাসন চালাবে, যার উদ্দেশ্য হবে ইমাম আল-মাহদীকে আক্রমণ করা এবং ধ্বংস করা যিনি হবেন সদ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম খিলাফত রাষ্ট্রের নেতা। সুতরাং, সিরিয়ার উপর এই বিশাল ইসরায়েলি সামরিক আগ্রাসনের উদ্দেশ্য হবে মুসলিম বিশ্বের উপর 'প্যাক্স জুডাইকা' বা ইহুদি-আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়া।

ইমাম মাসজিদের ভেতরে অবস্থান করবেন, এবং দাজ্জালের নেতৃত্বাধীন ইসরায়েলি সশস্ত্র বাহিনী মাসজিদটি ঘিরে ফেলবে এবং কোণঠাসা হয়ে পড়া ইমামকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত থাকবে, যার পালানোর আর কোনো পথই অবশিষ্ট থাকবে না। আর তখন ইতিহাস ঠিক সেইভাবেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে, যেভাবে ফেরাউনের নেতৃত্বে এক অহংকারী, এবং অত্যাচারী মিশরীয় সেনাবাহিনী মূসা (আঃ) এবং বনী ইসরাঈলকে লোহিত সাগরের তীরে কোণঠাসা করে ফেলেছিল, তাদের পালানোর আর কোনো পথই অবশিষ্ট রাখেনি। ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন মিশরীয় সেনাবাহিনী চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য উদ্যত হয়েছিল, মহান আল্লাহ হস্তক্ষেপ করলেন এবং অলৌকিকভাবে সাগরকে বিভক্ত করে মূসা ও বনী ইসরাঈলের পালানোর পথ করে দিলেন। আর যখন ফেরাউন ও মিশরীয় সেনাবাহিনী সাগরের সেই উন্মুক্ত পথ দিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করার চেষ্টা করল, তখন পানি তাদের উপর নেমে এসে তাদের সকলকেই ডুবিয়ে দিল। ঠিক একইভাবে, আল্লাহ ইমামকে রক্ষা করার জন্য হস্তক্ষেপ করবেন মসীহকে প্রেরণের মাধ্যমে, যিনি মাসজিদের ভেতরেই অবতরণ করবেন।
সালাতের পর মসীহ মাসজিদ থেকে বের হবেন, অতঃপর দাজ্জালকে ধাওয়া করে তাকে হত্যা করবেন, এবং বিশ্ব তখন সেই শয়তানী সত্তার হাত থেকে মুক্তি পাবে:

إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ، فَرَجَعَ ذَلِكَ الإِمَامُ يَنْكُصُ ... يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ. فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: افْتَحُوا الْبَابَ. فَيُفْتَحُ، وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِيٍّ كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلًّى وَسَاجٍ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا، وَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا. فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ، فَيَقْتُلُهُ ...

"...তখন ফজরের সময় তাদের মাঝে মরিয়মের পুত্র ঈসা নেমে আসবেন। তখন সেই ইমাম (ইমাম মাহদী) পিছিয়ে যেতে চাইবেন, যাতে ঈসা (আঃ) এগিয়ে গিয়ে নামায পড়াতে পারেন। তখন ঈসা (আঃ) তাঁর দুই কাঁধের মাঝে হাত রেখে তাঁকে বলবেন, 'এগিয়ে যান এবং নামায পড়ান, কারণ এই নামাযের ইকামাত আপনার জন্যই দেওয়া হয়েছে।' তখন তাদের ইমামই তাদের নামায পড়াবেন। নামায শেষ হলে ঈসা (আঃ)-বলবেন, 'দরজা খোলো।' তখন দরজা খোলা হবে, আর তার পেছনেই থাকবে দাজ্জাল। তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইহুদি, যাদের সবার কাছেই থাকবে দামি

তরবারি ও সবুজ চাদর। যখনই দাজ্জাল ঈসা (আঃ)-কে দেখবে, সে পানিতে লবণ যেমন গলে যায়, তেমন গলে যেতে থাকবে এবং পালিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। ঈসা (আঃ)- বলবেন, 'তোকে আমার একটি আঘাত করার আছে, তুই তার থেকে পালাতে পারবি না।' শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে 'লুদ' নামক স্থানের পূর্ব দিকের ফটকের কাছে ধরে ফেলবেন এবং হত্যা করবেন..."

সুনান ইবন মাজাহ

পাঠকের জন্য এটা কল্পনা করা কঠিন হওয়ার কথা নয় যে, এক অহংকারী, সর্বজয়ী এবং অজেয় আক্রমণকারী ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের মসীহকে একটি মাসজিদ থেকে বের হয়ে আসা মাত্র একজন ব্যক্তির হাত থেকে পালিয়ে যেতে দেখে সম্পূর্ণরূপে মনোবল হারিয়ে ফেলবে। সে তাঁর হাত থেকে পালাবে, যদিও সে, অর্থাৎ ইহুদি মসীহ, একটি বিশাল সশস্ত্র বাহিনীর নেতা ছিল, যা মাসজিদটি ঘিরে রেখেছিল।
আমাদের অভিমত এই যে, তাদের মসীহকে মাত্র একজন ব্যক্তির কাছ থেকে পালিয়ে যেতে দেখার এই দৃশ্য, যিনি তাদের সেনাবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি মাসজিদ থেকে বের হয়ে এসেছেন তাৎক্ষণিকভাবে সেই সমগ্র সেনাবাহিনীকে এই প্রত্যয়ে উপনীত করবে যে, তারা প্রতারিত হয়েছে এবং একজন ভণ্ড মসীহকে প্রকৃত মসীহ হিসেবে গ্রহণ করেছে। সেই সেনাবাহিনী তখন তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করবে যে, যে ব্যক্তি তাদের ভণ্ড মসীহকে ধাওয়া করছেন, তিনিই প্রকৃত মসীহ, এবং নবী মুহাম্মদ (ﷺ) সত্যই বলেছিলেন। একারণেই এই লেখকের প্রত্যাশা এই যে, সমগ্র ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তখন আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে, এবং ইহুদি সৈন্যরা সেই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য দিগ্বিদিক পালাতে থাকবে, যার ভবিষ্যদ্বাণী নবী মুহাম্মদ (ﷺ)

সেই বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীটি নিম্নরূপ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ ".

وفي رواية مسلم: ... فَيَخْتَبِئُ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ . إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ .

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মুসলমানেরা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করবে। (মুসলমানেরা তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে যে) ইহুদি যদি কোনো পাথর বা গাছের আড়ালে লুকায়, তবে সেই পাথর বা গাছও কথা বলে উঠবে, 'হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই তো আমার পেছনে এক ইহুদি লুকিয়ে আছে। এসো, তাকে হত্যা করো।' তবে 'গারকাদ' গাছ ব্যতীত, কেননা তা ইহুদিদের গাছ।"

সহীহ বুখারী:

আমাদের পাঠকরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, দাজ্জাল মারা যাওয়ার পর এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের ধ্বংস হওয়ার পর যারা দাজ্জালের আদেশে পরিচালিত হত এবং ভয়ে পালাচ্ছিল তখন তথাকথিত পবিত্র ইসরায়েল রাষ্ট্রটি দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে। আর ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই নবী মুহাম্মদ (ﷺ) মসীহ ফিরে আসার পর তিনি যে সকল কার্য সম্পাদন করবেন, সে সম্পর্কে আরও তথ্য প্রকাশ করেছেন:

لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ - يَعْنِي عِيسَى - وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الإِسْلاَمِ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِسْلاَمَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ .

"আমার এবং তাঁর (অর্থাৎ ঈসার) মাঝে আর কোনো নবী নেই। আর নিশ্চয়ই তিনি (ঈসা) অবতরণ করবেন। যখন তোমরা তাঁকে দেখবে, তখন তাঁকে চিনে নিও: তিনি হবেন মাঝারি গড়নের, লাল ও সাদার মিশ্রণে উজ্জ্বল বর্ণের অধিকারী, দুটি হলুদ রঙের পোশাক পরিহিত। তাঁর চুল থেকে পানি টপকাতে থাকবে, যদিও তা ভেজা থাকবে না। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের সাথে যুদ্ধ করবেন। অতঃপর তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর রহিত করবেন। আল্লাহ তাঁর সময়ে ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল 'মিল্লাত' (ধর্মীয় সম্প্রদায় বা জীবনব্যবব্যবস্থা)-কে বিলুপ্ত করে দেবেন। এবং তিনি ভণ্ড মসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, তারপর মৃত্যুবরণ করবেন এবং মুসলিমগণ তাঁর জানাযার সালাত আদায় করবে।"

সুনানে আবু দাউদ

মসীহ ইসলামের জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করবেন

দাজ্জালকে হত্যা করার পর মসীহ যে কাজগুলো করবেন, তার মধ্যে একটি হলো ইসলামের জন্য যুদ্ধ করা। গত কয়েকশ বছর ধরে পৃথিবীতে এত বেশি মগজধোলাই হয়েছে যে, বেশিরভাগ মানুষই 'ইসলাম' বলতে এমন একটি নতুন ধর্মকে বোঝে, যা নবী মুহাম্মদ (ﷺ) নিয়ে এসেছিলেন।

এই ধারণাটি পুরোপুরি ভুল। কেবল একজন চূড়ান্ত অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট মানুষই ইসলাম ধর্মকে শুধু নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে। কুরআন পরিষ্কারভাবে বলেছে যে, আল্লাহর কাছে একটিই মাত্র ধর্ম আছে; কাজেই, ইসলাম হলো সেই ধর্ম, যা আদম, ইব্রাহিম, মূসা থেকে শুরু করে ঈসা ও মুহাম্মদ (তাঁদের সকলের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) পর্যন্ত সবাই নিয়ে এসেছিলেন। কাজেই, মসীহ (আঃ) যখন ফিরে আসবেন, তখন যারা তাঁকে অনুসরণ করবে, তারাও ইসলাম ধর্মেরই অংশ হবে। ঈসা (আঃ) তখন যে যুদ্ধগুলো করবেন, তা সম্ভবত তাদের সাথেই করবেন, যারা তাঁর পবিত্র রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে আক্রমণ করবে। এমনও হতে পারে যে, যুদ্ধটা হবে বিশ্বের সেইসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যারা ‘প্যাক্স দেই’ (Pax Dei), অর্থাৎ, আল্লাহর নাযিল করা সত্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি বিশ্বব্যবস্থাকে মানতে এবং তার অধীনে আসতে অস্বীকার করবে।

এই যুদ্ধ কোনোভাবেই তাদের বিরুদ্ধে হতে পারে না, যারা তাঁকে আক্রমণ করেনি, তাঁর রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেনি এবং যে সত্য নিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন, তা অস্বীকার করেনি। যুদ্ধ শেষে, তিনি বিশ্বের বাকি সব ধর্ম ও জীবনব্যবস্থাকে শেষ করে দেবেন। কেবল একটিই টিকে থাকবে সেই একমাত্র সত্য ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা, যা আল্লাহ মানুষের জন্য ঠিক করেছেন, আর যার নাম তিনি দিয়েছেন ইসলাম, অর্থাৎ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ।

তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর রহিত করবেন

যখন মসীহ ফিরে আসবেন এবং সেই ক্রুশ ভাঙবেন, যার উপর তাঁকে শূলে চড়ানোর কথা ছিল, তখন তিনি বিশ্বের ইহুদিদের যারা তাঁকে ক্রুশে চড়াতে চেয়েছিল এক কঠোর বার্তা দেবেন, আর তা হলো: তাদের শাস্তির সময় এসে গেছে। যখন তিনি শূকর হত্যা করবেন, তখন সেই ভাষাটি হবে সেইসব ইহুদিদের বিরুদ্ধে আল্লাহর প্রচণ্ড রাগের প্রকাশ, যারা আসল মসীহকে অস্বীকার করেছিল এবং তার বদলে এক ভণ্ড মসীহকে অনুসরণ করেছিল। তারাই হলো সেই 'শূকর', যাদেরকে এখন মৃত্যু ও চূড়ান্ত ধ্বংসের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হবে।

জিযিয়া হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনে (সূরা আত-তাওবাহ, ৯:২৯) সেইসব আহলে কিতাবের উপর ধার্য করা একটি শাস্তিমূলক কর, যারা একটি ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে হেরে গেছে, কিন্তু সেই এলাকাতেই থাকতে চায়, যা এখন মুসলিমদের দখলে। এই করটি নিজ হাতে দিতে হবে, যা প্রমাণ করে যে, তারা সেই এলাকার উপর মুসলিম শাসন মেনে নিয়েছে। মসীহ কর্তৃক জিযিয়া তুলে দেওয়া এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি ফিরে আসার পর আহলে কিতাবের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না; আর তাই, এটি তাদেরই মতকে সমর্থন করে, যারা বলে যে, ইতিহাসের শেষে একটিই মাত্র উম্মত থাকবে।

আমরা পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আল্লাহর তৈরি করা কোনো আইন কেবল আল্লাহ নিজেই পরিবর্তন করতে পারেন। আর তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি যখনই কোনো পুরোনো আইন পরিবর্তন করেন, তখন তার জায়গায় এমন একটি নতুন আইন আনেন, যা হয় আগেরটার চেয়ে ভালো অথবা তার মতোই (কুরআন, আল-বাকারাহ, ২:১০৬)।

যদি মহান আল্লাহ জিযিয়া বাতিল করে দিতেন এবং এই খবরটি মসীহকে জানাতেন, তবে এর বদলে কোন নতুন আইন এসেছে, তাও আমাদের জানানো হতো। এমন কোনো তথ্য কখনোই দেওয়া হয়নি; কাজেই, জিযিয়া বাতিলের ঘোষণাটি অসম্পূর্ণ। আর তাই, এটি গ্রহণ করা যায় না।

এর সাথে সাথেই, জিযিয়া বাতিলের তাৎপর্যটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জিযিয়া বাতিল করার মানে হলো, আহলে কিতাব যারা মসীহের অনুসারী হবে তাদের আলাদা কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু একটি হাদীস কুরআনের সেই অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে যেতে পারে না, যা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, মসীহের অনুসারী সম্প্রদায়টি পৃথিবীর শেষ পর্যন্তই থাকবে।

নবী মুহাম্মদ (ﷺ) মসীহের প্রত্যাবর্তনের সময় সংঘটিত হবে এমন আরও কিছু ঘটনা সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করেছেন; তবে, সেই তথ্যগুলো তাঁর প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্য ও পরিণামের সাথে সম্পর্কিত নয়, এবং একারণেই আমরা সেগুলোকে এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের পাঠকগণ অন্যান্য উৎস থেকে সহজেই সেই তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন।

শেষ কথা

এই গ্রন্থটি শেষ করার মুহূর্তে আমাদের চূড়ান্ত মন্তব্য এই যে, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কলুষমুক্ত মন ও হৃদয়ের অধিকারী কোনো খ্রিস্টানই, এর বিপরীতে সকল অবিরাম পশ্চিমা প্রচারণা সত্ত্বেও, এই গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করে এই প্রত্যয়ে উপনীত না হয়ে পারবেন না যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষে সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহরই অবতীর্ণ বাণী এবং মুহাম্মদ (ﷺ) প্রকৃতপক্ষে সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহরই সত্য নবী।

আমাদের উদ্দেশ্য কখনোই এমন খ্রিস্টানদেরকে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসারী হওয়ার জন্য প্ররোচিত করা নয়; বরং, আমরা কেবল এটুকুই চাই যে, তারা যেন এই সত্যকে উপলব্ধি করে এবং মেনে নেয় যে, **"তোমাদের উপাস্য এবং আমাদের উপাস্য, এক ও অদ্বিতীয় উপাস্য"**।

ইমরান নজর হোসেনের বইসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা

ইতিপূর্বে প্রকাশিত:

1. কুরআনে জেরুজালেম
2. সূরা আল-কাহফ এবং আধুনিক যুগ
3. আধুনিক বিশ্বে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি
4. দাজ্জাল, কুরআন এবং আউয়াল আল-জামান (সময়ের শুরু)
5. মসীহ, কুরআন এবং আখেরুজ্জামান (শেষ কাল)
6. কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি
7. আধুনিক যুগে কেয়ামতের আলামতসমূহ
8. ইসলামি ভ্রমণকাহিনী - ২০০৮
9. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সুদের (রিবা) নিষেধাজ্ঞা
10. সূরা আল-কাহফ: ব্যাখ্যা ও ভাষ্য
11. ইসলামে স্বপ্ন ও আধ্যাত্মিক দর্শনের কৌশলগত গুরুত্ব
12. আধুনিক যুগে ইসলাম ও বৌদ্ধধর্ম
13. খিলাফত, হেজাজ এবং সৌদি-ওয়াহাবি জাতীয় রাষ্ট্র
14. কুরআন, দাজ্জাল এবং আল-জাসাদ
15. কুরআনে কনস্টান্টিনোপল
16. কুরআন এবং চন্দ্র
17. এক জামাত – এক আমীর
18. ইব্রাহিমী ধর্ম এবং ইসরায়েল রাষ্ট্র
19. কুরআন, মহাযুদ্ধ এবং পশ্চিম
20. ইসরায়েলের রহস্যময় সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডার ব্যাখ্যা
21. স্বর্ণের দিনার এবং রৌপ্য দিরহাম
22. ইসলামি ভ্রমণকাহিনী - ২০০৩
23. রোজা এবং শক্তি
24. ইকবাল এবং পাকিস্তানের সত্যের মুহূর্ত
25. ইসলামে সুদের (রিবা) নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব
26. মাদকাসক্তি এবং মদ্যপানের চিকিৎসায় কুরআনের পদ্ধতি
27. আল-ইসরা এবং আল-মিরাজের কৌশলগত গুরুত্ব
28. আখেরুজ্জামানে বিশ্বমঞ্চে মদিনার প্রত্যাবর্তন

29. আখেরুজ্জামানে খিজিরের (আ.) পদচিহ্নের সন্ধানে
30. জর্জ বার্নার্ড শ এবং ইসলামি পন্ডিত
31. আমেরিকায় ৯/১১ হামলার বিষয়ে এক মুসলিমের প্রতিক্রিয়া
32. মুসলিম সমাজের কুরআনিক ভিত্তি ও কাঠামো (২ খণ্ডে)
33. **বর্তমানে প্রকাশিত:**

    মসীহ, কুরআন এবং আখেরুজ্জামান
34. **শিগগিরই প্রকাশিত হবে (ইনশাআল্লাহ):**
35. কুরআন এবং রাশিয়ার ভাগ্য/নিয়তি
36. সময়ের ধারায় দাজ্জালের পদচিহ্ন
37. ইতিহাসে দাজ্জালের পদচিহ্ন

বইয়ের সম্পূর্ণ সেট (স্বাক্ষরিত) পেতে ইমেইল করুন: inhosei@imranhosein.org

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর।

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি কোনো পেশাদার লেখক বা অনুবাদক নই; আমি অতি সাধারণ ও নগণ্য একজন মানুষ। বর্তমান এই 'ফিতনার যুগে' সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝা যখন কঠিন হয়ে পড়েছে, তখন ইসলামের 'আখেরুজ্জামান' বা শেষ জামানা বিষয়ক গবেষণার প্রতি এক গভীর আত্মিক তাগিদ থেকেই বিশ্ব বরেণ্য আলেম, গবেষক ও লেখক শেখ ইমরান নজর হোসেনের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে আমার পরিচয়। তাঁর লেখা *"মসীহ, কুরআন এবং আখেরুজ্জামান"* বইটি পড়ার পর আমি অনুভব করেছি যে, এর বার্তা প্রত্যেকটি মুসলিমের জানা কতটা জরুরি। সেই তাড়না থেকেই এই বইটি অনুবাদ করার দুঃসাহস করেছি।

এই বইটিতে লেখক পবিত্র কুরআনের আলোকে প্রকৃত মসীহ হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন, ভণ্ড মসীহ দাজ্জালের প্রতারণা এবং আমরা বর্তমানে যে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তার এক বিস্ময়কর বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। আমাদের ঈমান রক্ষা এবং আগত মহাবিপদ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য এই জ্ঞানটুকু বাংলা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াকেই আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনের একটি বড় দায়িত্ব বলে মনে করেছি।

আমি আবারও স্বীকার করছি, ভাষাগত দক্ষতায় আমি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই অনুবাদ করতে গিয়ে হয়তো অনেক জায়গায় শব্দ চয়ন বা বাক্য গঠনে ভুলভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। তবে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বিশ্ববরেণ্য এই লেখকের মূল বক্তব্য এবং তাঁর আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনাকে যথাযথভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটিগুলো আপনারা ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আমি আশা রাখি।

যদি এই অনুবাদের মাধ্যমে সামান্য একজন পাঠকও আখেরুজ্জামান সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার পথ খুঁজে পান, তবেই আমার এই শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান করুন। পরিশেষে, মহান আল্লাহর দরবারে আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা—তিনি যেন আমার এই নগণ্য খিদমতটুকু কবুল করে নেন এবং এর উসিলায় আমার শ্রদ্ধেয় মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনসহ পরিবারের সকল সদস্যকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম জাজা দান করেন। আমিন

মোহাম্মাদ মালেক
নিউ মার্কেট, খুলনা, বাংলাদেশ।
২৭ এপ্রিল, ২০২৬